ভগিনী নিবেদিতা

- তপন কুমার রায়

ভগিনী নিবেদিতা

উত্তর আয়ারল্যান্ডের টাইরোন কাউন্টির ডানগান নামের একটা ছোট্ট শহরে ২৮শে অক্টোবর ১৮৬৭ সালে মার্গারেট এলিজাবেথ নোব্‌ল নামে যে ছোট্ট শিশু কন্যা জন্মগ্রহণ করলেন তিনিই উত্তরকালে আমাদের সবার শ্রদ্ধেয় ভগিনী নিবেদিতা। পিতা স্যামুয়েল রিচারড নোব্‌ল ও মাতা মেরি নোব্‌ল। তার ধর্মযাজক পিতামহ জন নোব্‌ল ও দেশসাধক মাতামহ আয়ারল্যান্ডে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় ভাবে অংশ গ্রহণ করতেন। অত্যন্ত অল্প বয়সে মার্গারেট পিতৃহীন হলে তার মধ্যেও পারিবারিক রাজনৈতিক আবহাওয়া প্রভাব ফেলে।

ইংল্যান্ডে হ্যালিফাক্স কলেজের ছাত্রী হিসেবে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে পরের দশ বছর মার্গারেট কেশউইক, রেক্সাম ও চেষ্টারে সগৌরবে শিক্ষকতা করেন। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে নিজের আদর্শ মুক্ত-শিক্ষা পদ্ধতি প্রয়োগ করলেন নিজের প্রতিষ্ঠিত 'রাস্কিন স্কুলে'। উইম্বলডনে তিনি ততদিনে একজন জনপ্রিয় শিক্ষয়িত্রী। এ ছাড়া সিসেম ক্লাবের সম্পাদিকা হিসেবে তাঁর নাম শিক্ষিত মহলে ছড়িয়ে পড়েছিল। সিসেম ক্লাবের সভায় যারা বক্তৃতা দিতে এসেছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাম হল, বার্নারড শ, বারট্রান্ড রাসেল, এইচ জি ওয়েলস, সিডনি ওয়েব এবং বিয়াট্রিস ওয়েবের মত বিখ্যাত মানুষ। নারী আন্দোলন নিয়েও উনি সেই সময়ে ইংল্যান্ডের বহু পত্র পত্রিকায় লিখেছিলেন।

স্বভাবগত ভাবে মারগারেটের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার ছাড়াও জনসেবা মূলক কাজ করার জন্য একটা চেষ্টা সর্বদা কাজ করত। কিন্তু শত কাজের মধ্যেও ওঁর মধ্যে একটা অনিশ্চয়তা, নিঃসঙ্গতা ও সংশয়ের বেদনা রয়ে গিয়েছিল। এই সময় ১৮৯৭ সালে লন্ডন সফররত বীর সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের কয়েকটি বক্তৃতা ও আলোচনা শুনে তিনি যেন নতুন কোন আলোকবর্তিকার সন্ধান পেলেন। আর পেলেন আত্মবিশ্বাস ও নিজেকে নতুন ভাবে উপলব্ধি করার ক্ষমতা। বিবেকানন্দের মানবপ্রেম, উদাত্ত বাণী ও দুর্জয় কর্মশক্তি মার্গারেটকে উদ্বুদ্ধ করল। স্বামীজির আহ্বানে সাড়া দিলেন এবং প্রতিশ্রুতি দিলেন যে আমৃত্যু উনি স্বামীজির কর্মযজ্ঞে শামিল থাকবেন

কথামত উনি ১৮৯৮ সালের ২৮শে জানুয়ারি কোলকাতার মাটিতে পা রাখলেন এবং বাকী জীবন ভারতের উন্নতি কল্পে নিজের জীবন উৎসর্গ করেন। স্বামীজী বলতেন, নিবেদিতা এখানে গুরু গিরি করেতে আসেনি। ও এসেছে নিজের জীবন ভারতের মানুষের জন্য দান করতে। স্বামীজি কোলকাতার স্টার থিয়েটারে একটি জনসভা আয়োজন করে কোলকাতার মানুষের কাছে মার্গারেটকে পরিচিত করান। তারপর মার্গারেট ১৮৯৮ সালের ২৫শে মার্চ বিবেকানন্দের মন্ত্রশিষ্য হয়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করলেন। জন্মসূত্রে পাওয়া পূর্বনাম ত্যাগ করে জগত সংসারে পরিচিত হলেন নিবেদিতা (The Dedicated) নামে। আপামর মানুষ তাঁকে চিনল ভগিনী নিবেদিতা নামে।

আজ ভারতবর্ষের অনেক জায়গাতেই ভগিনী নিবেদিতার জন্মের সার্ধশতবর্ষ পালন করা হচ্ছে। চেষ্টা চলছে ওনার জীবনী ও কর্মকাণ্ডের চুলচেরা বিশ্লেষণ করার। ধর্মীয় চেতনা, নারীশিক্ষার বিস্তার, সমাজসেবা, জাতীয়তাবাদ ও স্বাধীনতা আন্দোলন, সাহিত্য-শিল্প-বিজ্ঞানে অনুরাগ, ইতিহাস সচেতনতা ইত্যাদি নানা বিষয়ে ওনার বহুমুখী আগ্রহ দিয়ে উনি শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধনী-দরিদ্র ইত্যাদি সমাজের সমস্ত মানুষের কাছে তাঁদের প্রিয় ভগিনী হয়ে উঠতে পেরেছিলেন। ফলে ওনাকে এক একজন মানুষ এক একভাবে শ্রদ্ধা জানায়।

উত্তর কোলকাতার বাগবাজারের অন্তর্গত ১৭ নম্বর বোসপাড়া লেন হয়ে গেল ওনার পাকাপাকি ঠিকানা যা পরবর্তী সময়ে একটি তীর্থস্থান হয়ে ওঠে। এই বাড়ি থেকেই শুরু হয় ওনার প্রতিষ্ঠিত স্কুল মেয়েদের শিক্ষা বিস্তার করার জন্য। কালীপূজোর দিন শ্রী শ্রী সারদা মা স্বয়ং উপস্থিত থেকে স্কুলের উদ্বোধন অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন। সংঘ মাতা শ্রীমা নিবেদিতাকে আদর করে খুকি নামে সম্বোধন করতেন। লক্ষ্য করার বিষয় যে এই দুই মহীয়সী নারীর ভাব আদানপ্রদান করার জন্য ভাষা কিন্তু কোন বাধার সৃষ্টি করতে পারে নি। কারণ প্রথমদিকে ভারতে এসে নিবেদিতার তখনও পর্যন্ত বাংলা ভাষায় পুরোপুরি রপ্ত হওয়া হয়ে ওঠে নি।

স্বামী বিবেকানন্দ ও ভগিনী নিবেদিতা

স্বামীজির সঙ্গে এর পরে উনি ভারতের বিভিন্ন জায়গায় ভ্রমণ করেন ও ক্রমশ এখানকার মানুষজনের সঙ্গে পরিচিত হলেন। পরিচিত হলেন ভারতের বিভিন্ন জায়গার সংস্কৃতি ও জীবন ধারণের সঙ্গে। পরিচিত হলেন ভারতের মানুষের ধর্ম বিশ্বাসের প্রকৃতি ও ধারার সঙ্গে। এ সময় ওনার নজর এড়ায়নি কুসংস্কারগ্রস্ত ভারতীয় সমাজে সাধারণ মানুষের দারিদ্র্য ও বৈষম্য। ওনার চোখে পড়ে তৎকালীন ব্রিটিশ শাসকের অত্যাচারের এবং বিভেদ মূলক আচরণ। ওনার নজর এড়ায়নি বিবেকানন্দের বজ্র নির্ঘোষ উদাত্ত আহ্বান দেশের তরুণ সমাজকে কতটা উদ্বুদ্ধ করেছিল। উনি চেয়েছিলেন দেশের তরুণদের মধ্যে হোক muscles of iron, nerves of steel and gigantic wills. স্বামীজি চেয়েছিলেন দেশের নারীশক্তিকে জাগিয়ে তুলতে যা ভগিনী নিবেদিতার অন্তর স্পর্শ করেছিল। নিবেদিতার ব্রত হয়ে দাঁড়ালো নারীসমাজকে স্বাস্থ্য ও শিক্ষার অধিকারিণী করতে কারণ উনি মনে প্রানে বিশ্বাস করতেন যে অশিক্ষিত ও রুগ্ন মা কখনও প্রকৃত ভাবে সন্তান পালনে সক্ষম হতে পারে না। এরই মধ্যে উনি আবিষ্কার করলেন ভারতের ঐতিহ্যপূর্ণ ইতিহাস ও সংস্কৃতি। পণ করলেন দীর্ঘ দিনের জমে ওঠা কুসংস্কারের জঞ্জাল সরিয়ে ভারতের মানুষের কাছে আবার নতুন করে তুলে ধরবেন তাদের গর্বের ইতিহাস ও ঐতিহ্য।

স্বামীজী সে সময় রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বিরাট কর্মকাণ্ডের

আয়োজনে ব্যস্ত। নিবেদিতা স্থানীয় মানুষদের কাছে দেখতে দেখতে ঘরের মানুষ হয়ে উঠলেন। ওরা ওদের রক্ষণশীলতা ও প্রাথমিক জড়তা শীগগির কাটিয়ে উঠল। আমরা শুনেছি কোলকাতায় প্লেগের মহামারীর সময় উনি একা হাতে কেমন ভাবে মোকাবিলা করেছিলেন যখন তথাকথিত মধ্যবিত্ত বাসিন্দারা মহামারীর ভয়ে শহর ছাড়তে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন। একজন বিদেশিনীকে এ ভাবে সমাজসেবা ও শিক্ষা বিস্তারে জড়িয়ে পড়তে দেখে স্থানীয় কুসংস্কারে ডুবে থাকা মানুষ স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। তারা বুঝল যে উনি এসেছেন তাদের মধ্যে একজন হয়ে ভারতবর্ষকে ভাল বাসতে।

এই সময় উনি লক্ষ্য করলেন যে তলায় তলায় এক শ্রেণীর মানুষের মধ্যে শাসক ব্রিটিশ রাজের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ও বিদ্বেষ দানা বাঁধতে শুরু করেছে। দেশীয় মানুষের সঙ্গে ব্রিটিশদের বৈষম্যমূলক আচরণ এরা খোলা মনে মেনে নিতে পারছিল না। বিভিন্ন জায়গা থেকে বিভিন্ন মতের নেতৃত্ব উঠে আসছিল। এদের মধ্যে এক শ্রেণীর মত ছিল শাসকশ্রেণীর সশস্ত্র বিরুদ্ধতা করার।

ঠিক এরকম কোন সময়ে অরবিন্দ ঘোষের সঙ্গে ওনার পরিচিতি হলে উনি নিজের অজান্তেই সশস্ত্র বিপ্লবের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেন। অরবিন্দ ঘোষের কর্মযোগীন পত্রিকার সঙ্গেও উনি সরাসরি জড়িয়ে পড়েন. ওনার এই সব কর্মকাণ্ড স্বামীজির অগোচরে না থাকলেও এ বিষয়ে উনি নিজে থেকে নিবেদিতার এই নীতির বিরোধিতা কখনই করেন নি।

১৯০২ সালের ৪ঠা জুলাই স্বামীজির অকালপ্রয়াণ হলে ভারতের আকাশে একটা মহাশুন্যতার সৃষ্টি হয়। পরবর্তী কর্মপদ্ধতি নিয়ে রামকৃষ্ণ সংঘ স্বামীজির নির্দেশিত পথ অনুসরণ করার সিদ্ধান্ত নিলেও নিবেদিতাকে নিয়ে তাঁদের মনে একটা দোলাচলের সৃষ্টি হয়। ঘটনাপ্রবাহের গতি দেখে কিছুদিনের মধ্যেই নিবেদিতা রামকৃষ্ণ মিশন ও মঠ থেকে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সরিয়ে নিলেন যাতে ওনার আচার্য স্বামী বিবেকানন্দের নিজের হাতে গড়া প্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ডে কোনরকম ক্ষতি না হয়। ফলত স্বামীজীর সতীর্থ ও শিষ্যদের সঙ্গে ওনার ব্যক্তিগত সম্পর্ক অটুট থাকল এবং বাগবাজারের উদ্বোধন বাড়িতে শ্রী মায়ের স্নেহধন্য খুকুর যাতায়াতে একটুও খামতি পড়েনি। রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদের পর আত্মপরিচয় রূপে তিনি লিখতেন Nivedita of Ramakrishna-Vivekananda. সন্দেহ নেই এই পরিচয়ই ছিল তাঁর সবচেয়ে বড় পরিচয়।

ব্রিটিশ পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের নজর কিন্তু নিবেদিতার কর্মকাণ্ডের ওপর সর্বদাই সজাগ ছিল। স্বামীজীর প্রয়াণের পরবর্তী সময়ে যখন বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের শুরু হয় ব্রিটিশ পুলিশের মতে এই বাগবাজার অঞ্চলই ছিল সে আন্দোলনের আঁতুড় ঘর। তখনকার কোলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের একটি প্রতিবেদনে নিবেদিতার সম্বন্ধে লিখেছেন, "She settled down in Calcutta and lives a secluded life at 17 Bose Para Lane where she started a Bengali Girls' School on the model of a Kindergarten. She dresses in a semi native fashion and goes bear-headed without shoes". এই প্রতিবেদনটি থেকে সেসময়ের ইংরেজ পুরুষ সমাজে রক্ষণশীলতা ও মহিলাদের প্রতি সৌজন্যবোধের নমুনা খানিকটা হলেও পাওয়া যায়।

তদানীন্তন স্টেটসম্যান পত্রিকার সম্পাদক স্যামুয়েল র‍্যাটক্লিফ ছিলেন নিবেদিতার একজন গুণমুগ্ধ বন্ধু। ওই পত্রিকা সম্পাদকের উদ্দেশ্যে নিবেদিতার স্বনামে ও ছদ্মনামে লেখা প্রচুর চিঠি ছেপে ছিল। সম্পাদক মশায় এর ফলস্বরূপ শাসক গোষ্ঠীর কুনজর এড়াতে পারেন নি। ফলে শেষ পর্যন্ত তাঁকে এই কাগজের চাকরী ছাড়তে বাধ্য করা হয়। উনি নিবেদিতার দেহান্তরের পরে ১৯১১ সালের ডিসেম্বরে মডার্ন রিভিউ পত্রিকায় SISTER NIVEDITA: AN ENGLISH TRIBUTE নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন।

নিবেদিতার এই বিশাল কর্মকাণ্ডের মধ্যে কিন্তু সাহিত্য, কলা, সঙ্গীত, নাট্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর অনুসন্ধিৎসার কিছু মাত্র খামতি পড়ে নি। এর সঙ্গে চলতে থাকে তাঁর লেখা চিঠি ও প্রবন্ধের সম্ভার। ওনার লেখা কয়েকটি বইয়ের উল্লেখ করলেই এই বহুমুখী প্রতিভার খানিকটা পরিচয় পাওয়া যাবে।

ব্যক্তিগত ভাবে তিনি আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু ও অবলা বসুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ছিলেন। এ ছাড়া রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও ওনার বিশেষ গুণগ্রাহী ছিলেন। আমরা জানি ওনার অনূদিত রবীন্দ্রনাথের কাবুলিওয়ালা নামের ছোট গল্পটি কি ভাবে পাশ্চাত্যের সাহিত্য জগতে আলোড়ন তুলে বিশ্বের মানুষের কাছে বাংলা ভাষার কদর বাড়িয়ে দেয়। নন্দলাল বসুকে কোলকাতার সদ্য প্রতিষ্ঠিত আর্ট কলেজ ছেড়ে ভারতীয় কলা শিক্ষার জন্য একরকম জোর করে অজন্তা-ইলোরায় পাঠানো নিশ্চিতভাবে একটা নতুন ইতিহাস রচনা করেছিল। ঠাকুরের পরম ভক্ত নাট্যকার গিরীশ চন্দ্র ঘোষ অনেক সময়ে ভগিনী নিবেদিতার কাছে অনুপ্রেরণা পেয়ে থাকতেন। বিখ্যাত সাহিত্যিক দীনেশ চন্দ্র সেন ওনার কাছে প্রায়ই আসতেন তাঁর লেখার পাণ্ডুলিপি দেখাতে। খ্রিস্ট ধর্মে বিশ্বাসী পরিবারে জন্মে এবং পরবর্তী কালে ব্রহ্মচর্যে দীক্ষিত হয়েও নিবেদিতার অন্য কোন ধর্ম বিশ্বাসে ছুৎমার্গ ছিল না। সমস্ত ধর্মের মানুষদের ছিল ওনার কাছে অবারিত দ্বার।

ওনার লেখা বইগুলি হল -

Kali the Mother Sonnenchein & Co 1900

The Web of Indian Life W. Heineman 1904

Crude Tales of Hinduism Longmans 1907

An Indian Book of Love and Death Longmans 1908

The Master as I Saw Him (Being pages from the Life of Swami Vivekananda, London, Longmans. Udbodhon Office, Calcutta

Civic and National Ideas Udbodhon, Calcutta 1911

ওনার ওপর যারা লিখেছেন সেই তালিকায় রয়েছেন স্যর যদুনাথ সরকার, আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু, লেডী অবলা বসু, এফ জে আলেকজান্ডার, টি কে চেইনই, এস কে র‍্যাটক্লিফ, রামানন্দ চ্যাটারজী, ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ, ডঃ ভুপেন্দ্র নাথ দত্ত, সি এফ এন্ড্রুজ, গোপাল কৃষ্ণ গোখলে, মোহিত লাল মজুমদার, টি ভি আইয়ার, ও সি গাঙ্গুলি, কে এস রামাস্বামী শাস্ত্রী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রমেশ চন্দ্র মজুমদার, রাধা গোবিন্দ কর, লিজেল রেমঁ, এরিক হ্যামন্ড, বি জি খের, মহাত্মা গান্ধী, সুমিতোরা নোমা, শঙ্করী প্রসাদ বসু ছাড়াও রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সন্ন্যাসী ও ভক্তরা আর আধুনিক যুগের অজস্র ঐতিহাসিক, ইতিহাসবিদ ও গবেষকরা।

নিবেদিতার প্রতিভা ও চরিত্র বিচিত্রধর্মী হওয়ার জন্য সমসাময়িক অনেকে তাঁকে নানাভাবে দেখেছেন। কেউ ছিলেন বন্ধুর মত অন্তরঙ্গ, কেউ গুরুজনের মত শ্রদ্ধার্হ, কেউ বা বালকের মত স্নেহের পাত্র – ভৎর্সনার পাত্রও বটে। আমরা বেশিরভাগ মানুষ ওঁর শ্বেতশুভ্র গাউন পরা পোশাক আর গলায় রুদ্রাক্ষের মালা দেখে অভ্যস্ত। ওঁর ব্যক্তিত্বের মধ্যে পাই হিমালয়ের শান্ত ভাব আর ওঁর কর্মকাণ্ড দেখে জানতে পারি উনি ছিলেন বজ্রের চেয়েও কঠিন চরিত্রের মানুষ। আজ ওনার জন্মের সার্ধশতবর্ষ পালনের সময় একটু ভেবে দেখি আমরা কি ওনার সঠিক মূল্যায়ন করতে পেরেছি?

মাত্র ৪৪ বছর বয়সে ১৯১১ সালের ১৩ই অক্টোবর দার্জিলিং-এ এক নিশিভোরে রায়-ভিলায় স্বল্প অসুস্থতার পরে উনি নশ্বর দেহ ছেড়ে রামকৃষ্ণ লোকে বিলীন হয়ে যান। উপনিষদের রুদ্রমন্ত্র জপের মধ্যে তাঁর শেষ বাণী ছিল The boat is sinking, but I shall see the Sun Rise. মৃত্যুর সময় ওনার পাশে ছিলেন আচার্য জগদীশ চন্দ্র ও তাঁর সহধর্মিণী লেডী অবলা বসু। ওই শৈল শহরে ওনার শেষকৃত্য সম্পন্ন করে ওনার চিতা ভস্ম অদূরে একটি জায়গায় সমাধিস্থ করা হয়। সমাধির ওপর শ্বেতপাথরের ফলকে লেখা Here repose the Ashes of Sister Nivedita (Margaret E. Noble of the Ramakrishna, Vivekananda) who gave her all to India. ■

তথ্যপঞ্জী

১) ধ্রুপদী-এষণা – ভগিনী নিবেদিতা জন্মসার্ধশতবার্ষিকী সংখ্যা

২) Nivedita, Ratcliffe and The Statesman. The Statesman Festival number 2012 Tarun Goswami

কবিতা ও গানের ভিতর দিয়ে যখন দেখি ভুবনখানি

- চন্দন আঢ্য

প্রদীপ জ্বালাবার আগে যেমন সলতে পাকাতে হয়, তেমনি লেখার গভীরে প্রবেশের পূর্বে কিছু নিরুপায় বাগ্‌বিস্তার আমার এই নিবন্ধে আজ করতে হচ্ছে। প্রথমেই স্পষ্ট করে দেওয়া যাক লেখার বিষয়। এই লেখায় আমাদের লক্ষ্য হল কবিতা ও গানের ভিতর দিয়ে রবীন্দ্রনাথের জীবনের একটি শিল্পিত খণ্ডচিত্র পাঠকের সামনে উপস্থিত করা। আর এক্ষেত্রে প্রধান সাক্ষী হিসেবে হাজির করানো হবে একটি করে গান ও কবিতাকে। গানটি বহুশ্রুত, 'আকাশ হতে খসল তারা', সুচিত্রা মিত্রের কণ্ঠে যা প্রায় অমরতা লাভ করেছে; আর কবিতাটি হল 'হায় গগন নহিলে তোমারে ধরিবে কেবা'। এটি রবীন্দ্রনাথের 'উৎসর্গ' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত।

গান থেকে জীবনে পৌঁছোনো, অর্থাৎ সৃষ্টি থেকে স্রষ্টার জীবনকে নির্মাণ করার প্রয়াস যে খুব একটা অমূলক নয়, তার জন্য আমরা তিনজন বিখ্যাত সাহিত্যিকের মতামত পেশ করব। প্রথমেই দেখা যাক এই বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের মত ঠিক কী ছিল। 'ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতাসংগ্রহ--ভূমিকা' শীর্ষক প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র স্পষ্ট করেই জানিয়েছেন, 'কবিত্ব বুঝিয়া লাভ আছে,সন্দেহ নাই, কিন্তু কবিত্ব অপেক্ষা কবিকে বুঝিতে পারিলে আরও গুরুতর লাভ। কবিতা দর্পণ মাত্র--তাহার ভিতর কবির অবিকল ছায়া আছে'। লক্ষ করবার বিষয়, কবিতা এখানে দর্পণ হওয়ায় সেখানে সরাসরি কবির মানস-প্রতিবিম্ব ফুটে উঠবে, কোনো প্রতিসরিত ছবি নয়। প্রাচ্যের ঔপন্যাসিকের মত ছেড়ে এবার পাশ্চাত্যের দিকে তাকানো যাক। অস্কার ওয়াইল্ডের উপন্যাস 'The Picture of Dorian Gray'-তে Basil Hallward বলেছিল -- 'We live in an age when men treat art as if it were meant to be a form of biography'। চিত্রবিষয়ক এই মন্তব্যকে যদি, ব্যাপ্তার্থে, যে-কোনো সাহিত্যশিল্পের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায় তা হলে স্পষ্ট হবে যে, সাহিত্যের মধ্যেই সুন্দরভাবে আত্মগোপন করে আছেন সাহিত্যিকেরা। সৃষ্ট রচনাকর্মের মধ্য থেকেই তাই গড়ে তোলা সম্ভব সাহিত্যিকদের জীবনী। কারণ সামাজিকতার খাতিরে প্রত্যেক মানুষের মতো সাহিত্যিকেরাও ক্ষেত্রবিশেষে মিথ্যাচারণ করতে পারেন, কিন্তু সৃজনশিল্পে তাঁরা সবসময়ই নিজেদের প্রকাশ করতে ব্যাকুল থাকেন। এই বিষয়ে আমাদের তৃতীয় সাক্ষী স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। তিনিও তো বলেছেন যে বাইরে থেকে জড়ো করা উপাদানের স্তূপ কিছুতেই প্রকাশ করতে সক্ষম হয় না কবির অন্তরঙ্গ জীবনেতিহাসকে। তিনি নিজেই জানিয়েছেন—

বাহির হইতে দেখো না এমন করে,
আমায় দেখো না বাহিরে।
আমায় পাবে না আমার দুখে ও সুখে,
আমার বেদনা খুঁজো না আমার বুকে,
আমায় দেখিতে পাবে না আমার মুখে,
কবিরে খুঁজিছ যেথায় সেথা সে নাহি রে। (উৎসর্গ-৬)

যেহেতু 'কবিরে পাবে না তাহার জীবনচরিতে', তাই তাঁকে সন্ধান করতে হবে তাঁর সৃষ্টির মধ্যে, কারণ সেখানেই 'গোপন বারতা লুকায়ে রাখিতে/ পারি নি আপন প্রাণে'। বলে রাখা প্রয়োজন, আমাদের উপরিউক্ত এই সিদ্ধান্তকে অবশ্য উসকে দিয়েছে ইন্দিরা দেবীকে লেখা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথেরই একটি চিঠি, যেখানে কবি বলেছেন--'জীবনে জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে অনেক মিথ্যাচারণ করা যায়, কিন্তু কবিতায় কখনও মিথ্যা কথা বলিনে--সেই আমার জীবনের সমস্ত গভীর সত্যের একমাত্র আশ্রয়স্থল'। পাঞ্চভৌতিক সভার ডায়ারি-লেখক ভূতনাথবাবুও তো সেইরকমই জানিয়েছিলেন--'কেবল পাঠকের এজলাসে লেখকের একটা এই ধর্মশপথ আছে যে,সত্য বলিব'।অর্থাৎ সৃজনশিল্পে লেখকরা চিরকালই সত্য কথা প্রকাশ করে থাকেন। অবশ্য সে সত্য সত্যরক্ষাপূর্বক বানিয়ে-তোলা-সত্য। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও এই নিয়মের কোনো ব্যত্যয় লক্ষ করা যায় না। তাই সৃষ্ট সাহিত্য থেকে সংগৃহীত উপাদানই রবীন্দ্রনাথের জীবন গড়ে তোলার একমাত্র নির্ভরযোগ্য উপাদান। আমাদের ভূমিকা এখানেই শেষ। এবার সরাসরি গানের মধ্যে প্রবেশ করব।

প্রথমে গানটিকে উদ্ধৃত করা যাক।

আকাশ হতে খসল তারা আঁধার রাতে পথহারা।
প্রভাত তারে খুঁজতে যাবে--ধরার ধূলায় খুঁজে পাবে
তৃণে তৃণে শিশিরধারা।
দুখের পথে গেল চলে--নিবল আলো, মরলো জ্বলে।
রবির আলো নেমে এসে মিলিয়ে নেবে ভালোবেসে,
দুঃখ তখন হবে সারা।

অত্যন্ত আপাত-নিরীহ এই গানটি প্রকৃতি-পর্যায়ের মধ্যে শরৎ-ঋতুর অন্তর্গত। কিন্তু এই গানে অসামান্যভাবে সংহত হয়ে রয়েছে রবীন্দ্রনাথের জীবনের একটি অতি-সত্য দিক। এবার বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হওয়া যাক। গানটির বাচ্যার্থ অতি সহজ। তাই সেটির ব্যাখ্যা অনাবশ্যক। ব্যঙ্গ্যার্থ অনুধাবনের জন্য প্রথমেই লক্ষ করতে বলব 'তারা' শব্দটিকে। তারা হল এমন একটি জিনিস যার সারা দেহ আলো দিয়ে ঘেরা। তাই 'তারা'কে 'আলোকবসনা' বলা যেতেই পারে। আলোর বদলে আমরা যদি 'জ্যোতি' শব্দটি ব্যবহার করি, তাহলে 'তারা' শব্দটির একটি প্রতিশব্দ হতেই পারে 'জ্যোতির্ময়ী'। এখন এই জ্যোতির্ময়ী শব্দটির নির্মোক মোচন করলে স্পষ্টতই প্রতীতি হয় যে, জ্যোতির্ময়ী হচ্ছেন কবির নতুনদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্ত্রী কাদম্বরী দেবী। গানটিতে আকাশ থেকে তারা খসে পড়ার খবরের মধ্য দিয়ে তারার আকস্মিক মৃত্যুর ছবিটি চকিত আভাসে পাঠকের সামনে তুলে ধরেন কবি। আর কে-না জানে যে কবির নতুন বউঠানেরও মৃত্যু হয় আকস্মিকভাবে, কারণ তিনি আত্মহত্যা করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথেরই একটি কবিতা উল্লেখ করি :

জ্যোতির্ময় তীর হতে আঁধার সাগরে
ঝাঁপায়ে পড়িল এক তারা,
একেবারে উন্মাদের পারা।

প্রসঙ্গত একটি তথ্য এখানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। 'তারকার আত্মহত্যা' শীর্ষক উপরিউক্ত কবিতাটি কিন্তু কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুর পূর্বেই রচিত। তাই রবীন্দ্রজীবনী-কারের সিদ্ধান্ত, কাদম্বরী দেবী তাঁর জীবনাহুতির পূর্বে অন্ততপক্ষে আর-একবার আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলেন। 'মনোদুঃখে আত্মঘাতী' হয়ে তারকার ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করার ইচ্ছার সঙ্গে আকাশ থেকে তারকার খসে পড়ার বিষয়টি একেবারে নির্বিরোধে মিশে যায়। নিজের প্রিয়তম পরিজনের এই প্রস্তুতিবিহীন আকস্মিক মৃত্যুতে প্রেমিক কবির তখন দিশেহারা অবস্থা। 'জীবনস্মৃতি'র 'মৃত্যুশোক' অধ্যায়ে এই বিষয়ের বিস্তৃত প্রমাণ আছে। অন্ধকার রাতে ছাদে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে প্রেমিক কবি তখন প্রায়ই গাইতেন 'আমার প্রাণের 'পরে চলে গেল কে' গানটি। প্রিয়জনের আকস্মিক মৃত্যুতে তখন 'মনটার মধ্যে সে কী ধাঁধাই লাগিয়া গেল'। এবার বোধহয় স্পষ্ট হল 'আঁধার রাতে পথহারা'-র প্রসঙ্গটি। এখন প্রশ্ন হল, কেন সেই তারকা

আকাশ থেকে খসে পড়ল? গানের মধ্যে এর যা উত্তর পাওয়া যায় তা হল : 'দুখের পথে গেল চলে--নিবল আলো, মরল জ্বলে'। আকাশ থেকে তারকার স্খলিত হয়ে পড়া একটি অনিবার্য বৈজ্ঞানিক সত্য। এর সঙ্গে দুঃখের তো কোনো সম্পর্ক থাকতে পারে না। অর্থাৎ তারকার উপর কবি মানবিকভাব আরোপ করে তাকে মানবীমূর্তি দান করেছেন। ঠাকুরবাড়ির বাজার-সরকার শ্যামলাল গাঙ্গুলির মেয়ে কাদম্বরী দেবী যে বাড়ির সকলের খুব প্রিয়পাত্রী ছিলেন এমনটা মনে করার কোনো কারণ নেই। বরং প্রতি মুহূর্তে তাঁকে এই খোঁটা শুনতে হত যে, তিনি জ্যোতির স্ত্রী হওয়ার মোটেই উপযুক্ত নন। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল অনাসক্ত স্বামীর অনাদর। তাই তাঁর জীবন ছিল দুঃখের।ফলত, তাঁকে জ্বলে-পুড়েই মরতে হয়েছিল, বা বলা ভালো 'শ্যামসমান' মৃত্যুকে বরণ করে নিতে হয়েছিল। কাদম্বরী দেবীর সহমর্মী দেওর তাঁর প্রিয়তম বউঠানের মনোদুঃখের কথা অত্যন্ত শিল্পিতভাবে 'তারকার আত্মহত্যা' কবিতায় প্রকাশ করে দিয়েছেন। একটু দীর্ঘ উদ্ধৃতিসহ দেখে নেওয়া যাক, কেন জ্যোতির্ময়ী কাদম্বরীকে আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে হয়েছিল—

কেন গো,কী হয়েছিল তার।
একবার শুধালে না কেহ--
কী লাগি সে তেয়াগিল দেহ।
যদি কেহ শুধাইত
আমি জানি কী যে সে কহিত।
যতদিন বেঁচে ছিল
আমি জানি কী তারে দহিত।
সে কেবল হাসির যন্ত্রণা,
আর কিছু না!
জ্বলন্ত অঙ্গারখণ্ড ঢাকিতে আঁধার হৃদি
অনিবার হাসিতেই রহে,
যত হাসে ততই সে দহে।
তেমনি,তেমনি তারে হাসির অনল
দারুণ উজ্জ্বল—
দহিত,দহিত তারে,দহিত কেবল।
জ্যোতির্ময় তারাপূর্ণ বিজন তেয়াগি
তাই আজ ছুটেছে সে নিতান্ত মনের ক্লেশে
আঁধারের তারাহীন বিজনের লাগি।

তারা যেমন যত জ্বলে তত আলো দেয়, কাদম্বরী দেবীও তেমনি তাঁর মনোদুঃখ গোপনের জন্য হাসির অনলে নিজেকে দগ্ধ করে তুলতেন। শেষপর্যন্ত জ্যোতির্ময় গৃহ ছেড়ে তাঁকে বেছে নিতে হয় 'আঁধারের তারাহীন বিজনের' প্রদেশ। গানের ব্যাখ্যা এতদূর দেওয়ার পরও কিন্তু স্পষ্ট হল না খসে-পড়া তারা কেন শিশির হয়ে তৃণে তৃণে ছড়িয়ে পড়ল? আসলে,শিশির শব্দের উচ্চারণমাত্রেই কবির মনে ঘনিয়ে ওঠে একটি প্রেমের অনুষঙ্গ। এই প্রসঙ্গে 'লেখন'-এর একটি ছোটো কবিতার উল্লেখ করি : 'শিশির-সিক্ত বন-মর্মর/ব্যাকুল করিল কেন। ভোরের স্বপনে অনামা প্রিয়ার/কানে কানে কথা যেন'। অর্থাৎ শিশির-ভেজা বনের পাতা কবির মনে অনামা-প্রিয়ার স্মৃতি জাগিয়ে তোলে। আমার মতে,কবির এই 'অনামা-প্রিয়া' কিন্তু মোটেও কবির কাছে অপরিচিতা নন, বরং বিশেষ পরিচয়ের আড়ালে তিনি চির-অপরিচিত। আসলে তখনকার সামাজিক অবস্থানে প্রায়-সমবয়সী দেওর-বউঠানের সখ্য সম্পর্ককে লোকের পক্ষে হজম করা দুরূহ ব্যাপার ছিল। তাই কবি বাধ্য থাকতেন তাঁকে প্রকৃত নামে না-ডেকে অন্য কোনো নামে ডাকতে--'মোর মুখে পেলে তোমার আভাস/কত জনে কত করে পরিহাস,/পাছে সে না পারি সহিতে/নানা ছলে তাই ডাকি যে তোমায়,/কেহ কিছু নারে কহিতে'। সামাজিক মানুষ রবীন্দ্রনাথকে সারাজীবনই এই ছল করে যেতে হয়েছিল বলে তাঁর নতুন বউঠান কখনও আলোকবসনা, কখনও তারা বা তারকা, আবার কখনও জ্যোতির্ময়ী মূর্তিতে তাঁর লেখায় হাজির হন। এ ছাড়াও খেয়াল করে দেখুন 'হৈমন্তী' গল্পটি। এই গল্পের কথক অপুর স্ত্রীর প্রকৃত নাম হৈমন্তী হলেও প্রথমে অপু পাঠকের কাছে তাঁর স্ত্রীর নাম জানিয়েছিলেন 'শিশির'। মনে করে দেখুন, এই শিশিরকেও কিন্তু শ্বশুরবাড়িতে তীব্র গঞ্জনার মধ্যে পড়তে হয়েছিল এবং যার ফলে তাকে আত্মহত্যা পর্যন্ত করতে হয়েছিল বলে সংগত অনুমান করে নেওয়া চলে। কারণ অপু জানিয়েছেন, 'বুকের রক্ত দিয়া আমাকে যে দ্বিতীয় সীতাবিসর্জনের কাহিনি লিখিতে হইবে, সে কথা কে জানিত'। সীতা-বিসর্জনের কাহিনি উল্লেখের মধ্য দিয়ে সীতার ন্যায় আত্মাহুতির বিষয়টি ব্যঞ্জনার মধ্য দিয়ে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। শ্বশুর-বাড়ির অনাদরও শিশিরকে আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নিতে অতি পরোক্ষভাবে হলেও প্ররোচিত করে থাকতে পারে। কেন নিজের স্ত্রীর নাম অপু 'শিশির' দিয়েছিলেন প্রথমে? এর উত্তরে অপুর কৈফিয়ত এইরকম : 'শিশিরে ভোরবেলাটুকুর কথা সকালবেলায় আসিয়া ফুরাইয়া যায়'। কাদম্বরী দেবীর জীবনও তো অতি-সংক্ষিপ্ত, মাত্র পঁচিশ বছরের। জীবনের সকালবেলাতেই ফুরিয়ে গিয়েছিল তাঁর সব চাওয়া-পাওয়া। প্রিয়তম-বউঠানের মৃত্যুতে দিশেহারা, 'আঁধার রাতে পথহারা' কবি তাই প্রাথমিকভাবে চেয়েছিলেন শিশিরের সঙ্গে শিশির হয়ে মিশে যেতে, শিশিরের সঙ্গে একসঙ্গে মরণকে বরণ করে নিতে : ' "আমি কেন হই নি শিশির?"/কহে কবি নিশ্বাস ফেলিয়া।/ "প্রভাতেই যেতেম শুকায়ে/প্রভাতেই নয়ন মেলিয়া।/হে বিধাতা,শিশিরের মতো/গড়েছ আমার এই প্রাণ,/শিশিরের মরণটি কেন/আমারে কর নি তবে দান?" '। বিধাতার কাছে কবির এই প্রার্থনা পূরিত হয়নি বলেই ১৩২৬-এর মাঘ মাসে পরিণত-মনস্ক কবি চাইলেন নিজের জীবনের সঙ্গে সেই শিশিরবিন্দু মিশিয়ে নিতে। আলোচ্য গানের 'রবির আলো নেমে এসে' অংশের 'রবি' শব্দটিতে শ্লেষ অলংকার হয়েছে। 'রবি' শব্দের একটি অর্থ সূর্য--সূর্যের আলোতেই শিশির বাষ্পীভূত হয়ে সূর্যালোকের অংশ হয়ে পড়ে। আর 'রবি' শব্দের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ অর্থ রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং। অর্থাৎ,দাদার উপেক্ষা আর অবহেলায় যাঁকে আত্মহত্যা করতে হয়, সেই 'মানসসুন্দরী' যখন রবীন্দ্রনাথের ভালোবাসার অংশ হিসেবে নিজেকে তাঁর সঙ্গে মিশিয়ে দেবেন, তখন তাঁর অর্থাৎ শিশিরের 'দুঃখ তখন হবে সারা'। বউঠানকে দাদা যে-মুক্তি দান করতে পারেননি, তিনি নিজে তা পারবেন বলেই কবির স্থির প্রত্যয়। তাই 'লেখন'-এই তিনি জানান, 'আমার প্রেম রবি-কিরণ হেন/জ্যোতির্ময় মুক্তি দিয়ে তোমারে ঘেরে যেন'। কী অসামান্য প্রতিভা থাকলে তবেই মাত্র দুটি পঙ্‌ক্তির এই ধরনের স্বাক্ষর-কবিতাতে সংহত করা যায় নিজের হৃদয়ের কথাকে!

এই শিশিরের সূত্র ধরেই আমরা পেশ করাবো আমাদের দ্বিতীয় সাক্ষীকে।এটি একটি কবিতা। আগে কবিতাটি একবার পড়ে নেওয়া যাক।

'হায়	গগন নহিলে তোমারে ধরিবে কে বা।
ওগো	তপন তোমার স্বপন দেখি যে করিতে পারি নে সেবা।'
শিশির কহিল কাঁদিয়া,
'তোমারে রাখি যে বাঁধিয়া
হে রবি,এমন নাহিকো আমার বল।
তোমা বিনা তাই ক্ষুদ্র জীবন কেবলি অশ্রুজল।'

'আমি	বিপুল কিরণে ভুবন করি যে আলো,

তবু শিশিরটুকুরে ধরা দিতে পারি,
বাসিতে পারি যে ভালো।'
শিশিরের বুকে আসিয়া
কহিল তপন হাসিয়া,
'ছোটো হয়ে আমি রহিব তোমারে ভরি,
তোমার ক্ষুদ্র জীবন গড়িব
হাসির মতন করি।'

এইবার এই কবিতাটির সঙ্গে পূর্বোক্ত গানটিকে মিলিয়ে পড়া যাক। খসে-পড়া তারার তৃণে-তৃণে শিশিরধারায় রূপান্তরিত হয়ে যাওয়া শিশিরকে দেওয়া রবির আলোর আশ্বাসবাণীর সঙ্গে আলোচ্য কবিতার 'বিপুল কিরণে ভুবন' আলো-করা রবিপ্রদত্ত আশ্বাসবাণীর বস্তুতপক্ষে কোনো পার্থক্য নেই। কবিতাটির দ্বিতীয় স্তবকে সূর্যকেও বলতে শোনা যায়, ছোটো হয়ে তিনি শিশিরকে ভালোবাসায় ভরিয়ে তুলে তার ক্ষুদ্র জীবনকে হাসির মতন করে গড়ে তুলবেন। এখানে দুটি বিষয় আলাদা করে লক্ষ করার মতো। প্রথমত, জীবনের ভোরবেলায় যাঁকে আত্মহত্যা করতে হয়েছে, তাঁর জীবনের আয়তন অবশ্যই 'ক্ষুদ্র'। আর দ্বিতীয়ত, রবির ইচ্ছা শিশিরের ক্ষুদ্র জীবনকে হাসির মতন করে গড়ে তুলবেন। অর্থাৎ যতটুকু তাঁর জীবন ছিল, সেই জীবন নিশ্চয় হাসিময় ছিল না। জীবন কেন হাসিমাখা ছিল না, সেই প্রসঙ্গে পূর্বেই আলোচিত বলে তার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। খালি রবির এই ইচ্ছার মধ্য দিয়েই তাঁর মৃত বউঠানের জীবনের অশ্রুসিক্ত বেদনার কাহিনিটি অত্যন্ত পরিশীলিতভাবে উন্মোচিত হয়ে যায়। কবিতাটির দ্বিতীয় স্তবক যদি হয় রবীন্দ্রনাথের নিজের ভাষ্য,তবে প্রথম স্তবকটি অবশ্যই বউঠানের নিজের বয়ানে লেখা। ১৩০৯ বঙ্গাব্দে যখন এই কবিতাটি লিখিত হচ্ছে তখন বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। তাঁর আলোয় বাংলা কাব্যভূমি উদ্‌ভাসিত। ক্রমশ আসতে শুরু করেছে খ্যাতি। তাই নিজ-প্রতিভা সম্পর্কে সচেতন কবির স্পষ্টোক্তি 'আমি বিপুল কিরণে ভুবন করি যে আলো'। এই বিরাট জ্যোতিষ্কস্বরূপ প্রতিভাকে পরিমাপ বা অনুধাবন করার ক্ষমতা বিহারীলালের ভক্ত পাঠক নতুন বউঠানের থাকা বেশ শক্ত। তাই বউঠানকে দিয়ে নিজের প্রতিভার স্বীকৃতি আদায় করে নিচ্ছেন কবি। বউঠানকে দিয়ে বলাচ্ছেন 'হায় গগন নহিলে তোমারে ধরিবে কে বা'। যে-বউঠান তাঁর জীবদ্দশায় প্রিয় দেওরকে কিছুতেই বিহারীলালের উপরে স্থান দিতে চাননি, বিহারীলালকে নকল করে রবীন্দ্রনাথ লিখতেন বলে কপট-অনুযোগ জানাতেন, সেই বউঠানের মুখ দিয়েই রবীন্দ্রনাথ এবার বলিয়ে নিলেন নিজের শ্রেষ্ঠত্বের কথা। ঠিক যেমনভাবে ক্রমাগত রবীন্দ্রনাথের বিরোধিতা করে চলা অমিত রায়কেও তাঁর মনের শেষ কথাটি বলার ভার দিতে হয়েছিল বুড়ো-হয়ে-যাওয়া রবীন্দ্রনাথকে। অর্থাৎ,জীবন দিয়ে যা পারেননি, কাব্যের মধ্য দিয়ে তার মধুর প্রতিশোধ নিলেন। প্রতিশোধ শব্দের মধ্য দিয়ে কিন্তু হিংসার আভাস দিতে চাইছি না, বলতে চাইছি মন দিয়ে জিতে নেওয়ার আনন্দকে এবং অহং-তৃপ্তির বিষয়কে। রবীন্দ্রনাথের মতো বিরাট প্রতিভাকে বেঁধে রাখা সম্ভব নয় বলেই বউঠানের বক্তব্য 'তোমা বিনা তাই ক্ষুদ্র জীবন কেবলি অশ্রুজল'।

এখন একটি প্রশ্ন সংগত কারণেই এখানে দানা বাঁধে। এ-পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে এ-কথা মোটেও প্রমাণ করা যাবে না যে,রবীন্দ্রনাথকে লাভ করার জন্য কাদম্বরী অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে পড়েছিলেন। বরং রবীন্দ্রনাথের ন্যাওটা-পনায় তিনি বোধহয় কিঞ্চিৎ বিব্রতই বোধ করতেন। রবীন্দ্রনাথ তাই নিজেই জানিয়েছেন, 'বুঝেছি গো বুঝেছি সজনি,/কী ভাব তোমার মনে জাগে--/বুক ফাটা প্রাণ-ফাটা মোর ভালোবাসা/এত বুঝি ভালো নাহি লাগে।/ এত ভালোবাসা বুঝি পার না সহিতে,/এত বুঝি পার না বহিতে'। রবীন্দ্রনাথের এই 'রাহুর প্রেম' নিশ্চয় কাদম্বরীর কাছে অস্বস্তির কারণ হয়ে উঠেছিল : 'শুনেছি আমারে ভালো লাগে না,/নাই-বা লাগিল তোর,'। হাত-দেখার সময়ে বউঠানের হাতের স্পর্শ পেয়েই রবীন্দ্রনাথকে তাই খুশি থাকতে হয়েছিল—

একদিন বলেছিল, 'জানি হাত দেখা',
হাতে তুলে নিয়ে হাত নতশিরে গণেছিল রেখা—
বলেছিল, 'তোমার স্বভাব—
প্রেমের লক্ষণে দীন।' দিই নাই কোনোই জবাব।
পরশের সত্য পুরস্কার
খণ্ডিয়া দিয়েছে দোষ মিথ্যা সে নিন্দার।

হস্তরেখা বিচারের সময়টুকুতে কিছুক্ষণের জন্য বউঠানের হাতের স্পর্শ পেয়ে যে-কবিকে খুশি থাকতে হয়েছিল, তিনি তাহলে কেন বউঠানের মুখ দিয়ে উচ্চারণ করালেন রবিকে 'বাঁধিয়া' রাখার আকুতি? এরও উত্তর খুঁজতে হবে রবীন্দ্রনাথের লেখা থেকেই। যে-লেখক বিশ্বাস করেন যে-জীবন আমরা যাপন করছি তা যেমন আমার জীবন, ঠিক যে-জীবন আমরা যাপন করতে চাই সেই জীবনও আমার জীবন, সেই লেখক বা কবি তো নিঃসন্দেহে যে-কথা সারাজীবন ধরে শুনতে চেয়েও হয়তো-বা শুনতে পারেননি, সেই কথাকে সত্য বলেই স্বীকার করতে চাইবেন। আসলে বাস্তবের অতৃপ্তি নিয়ে তিনি আর চলতে চান না বলেই কল্পনা, স্বপ্ন বা কবিতার মধ্য দিয়ে তার পূরণ ঘটাতে চান। নিজের এই মানসিকতার কথা কবি কিন্তু একবারের জন্যও গোপন করতে চাননি। তাই নিজেই তিনি জানিয়েছেন :

মোর কিছু ধন আছে সংসারে,
বাকি সব ধন স্বপনে
নিভৃত স্বপনে।

এই 'নিভৃত স্বপনে'র ধনই বাণীরূপ লাভ করেছে আমাদের আলোচ্য কবিতার প্রথম স্তবকে। এইভাবে একটু ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে রবীন্দ্র-সাহিত্য পড়লে দেখা যায়, 'হৃদয়ের কথা বলিতে ব্যাকুল' কবি কী আশ্চর্য মানসিক আভিজাত্য নিয়ে তাঁর মনের কথাকে তাঁরই সাহিত্যে চিরায়ত বাণীমূর্তি দান করে গেছেন। ■

....

আমার এই লেখার জন্য যাঁর কাছে আমি একমাত্র ঋণী, তিনি হলেন আমার চিরায়ত মাস্টারমশাই তপোব্রত ঘোষ। তিনি রবীন্দ্রনাথ না পড়ালে এই লেখা তৈরিই হত না। এ ছাড়া বন্ধু শিঞ্জিনীর সঙ্গে প্রতিনিয়ত তর্ক-বিতর্কও আমার এই লেখার যুক্তিকে আরও নিশ্ছিদ্র করতে সাহায্য করেছে। এই প্রবন্ধের সকল উদ্ধৃতিই রবীন্দ্রনাথের জন্মের ১২৫ বছর উদ্‌যাপনের সময় পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত রচনাবলী থেকে সংগৃহীত।

মার্কিন খামার

- গৌতম সরকার

আমি যেখানে থাকি সেই দক্ষিণ মিনেসোটায় শহরগুলোর বাইরে গেলেই দেখা যায় ক্ষেত, খামারবাড়ি, চাষী এইসব। অ্যামেরিকার ছোট-বড় সব শহরের ক্ষেত্রেই এই একই কথা প্রযোজ্য। এখানে চাষবাস করা যায় শুধুই গ্রীষ্মকালে। এপ্রিল মাসে বরফ গলার পর, মে মাসে বীজ বপন, আর সেপ্টেম্বরের শেষের দিকেই ফসল গোলায় তোলা; কারণ অক্টোবরের শেষেই তো আবার শুরু হয় স্নোয়িং আর নইলে তার শুরুর জন্য দিন গোনা।

এদিকটায় চাষ হয় মূলত ভুট্টার। সেই ভুট্টার বেশিরভাগটাই আবার চাষ করা হয় গোরুকে খাওয়ানোর জন্য, কারণ মানুষই তো খায় আবার সেই গোরুকে। ভুট্টা ছাড়াও মূলত চাষ হয় আলু, নানান ধরণের বিন, আর সূর্যমুখী ফুলের (যার বীচি থেকে পাওয়া যায় তেল)।

এখানকার বেশিরভাগ চাষীদের (হয়তো সব চাষীরই) ছোটোখাটো প্লেন ওড়ানোর লাইসেন্স থাকে, কারণ ওরা প্লেন উড়িয়েই পেস্টিসাইড ছড়ায় ওদের ক্ষেতে। চাষীরা বেশ ধনী। বাড়ি, গাড়ি (একাধিক) এইসব তো থাকেই, সাথে থাকে চাষাবাদের প্রচুর জমিজমা, সরঞ্জাম আর এমনকি পেস্টিসাইড ছড়ানোর ঐ প্লেন পর্যন্ত! সব মিলিয়ে শহুরে মধ্যবিত্তদের থেকে এরা বেশী বিত্তবান।

তবে এদের ধন নয়, বছর তিরিশ আগে এদেশে আসার পর প্রথম প্রথম আমাকে যা অবাক করেছিলো (এখনো করে) তা হোল এই চাষীদের জ্ঞানের গভীরতা। চাষীরা মোটামুটি সকলেই নিদেনপক্ষে হাইস্কুল-গ্র্যাজুয়েট, আবার অনেকের কলেজ ডিগ্রীও থাকে; চাষাবাদ সংক্রান্ত বিষয়েই, এমনকি ইঞ্জিনিয়ারিং বা জেনেটিক-ইঞ্জিনিয়ারিং পর্যন্ত। আমার ধারণা এই চাষীরা আমাদের কোলকাতা ইউনিভার্সিটির সাধারণ বটানি, জুওলজি বা ঐ ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা বিভিন্ন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের স্নাতকদের থেকে গাছপালা, পোকামাকড় বা যন্ত্রপাতি সম্পর্কে বেশী জানে। আর শুধু জানেই না, সেই জ্ঞান দৈনন্দিন জীবনে রোজ কাজেও লাগায়, চাষের কাজে। দেশে ছাত্রাবস্থায় 'সবুজ বিপ্লব' সম্পর্কে পড়েছি, কিন্তু 'সবুজ বিপ্লব' যে ঠিক কতটা 'সবুজ' হতে পারে তা এদেশের ক্ষেত-খামার না দেখলে ঠিক জানতেই পারতাম না। পাঞ্জাবের সর্ষের ক্ষেত, বাংলার ধানের ক্ষেত, কেরালার নারকোলের 'ক্ষেত', কলোম্বিয়ার কলার ক্ষেত, ইটালির টমেটোর ক্ষেত বা জার্মানির আঙ্গুরের ক্ষেত; এইরকম অনেক ক্ষেতই দেখার সৌভাগ্য হয়েছে আমার - তবে অ্যামেরিকার ক্ষেতগুলো আলাদা। বিজ্ঞান, বিপ্লব আর ব্যবসা মিলেমিশে একাকার। দেখে মালুম হয় যে চাঁদ-মঙ্গলগ্রহ পাড়ি দেওয়ায় বা ফি-বছর সায়েন্স-টেকনোলজির বিভিন্ন শাখায় একাধিক নোবেল পুরস্কার পাওয়ায় নয়, অ্যামেরিকার আসল কৃতিত্ব হোল 'সেই টেকনোলজিকে' মানুষের সবচেয়ে প্রাথমিক প্রয়োজনের স্তরে, এমনকি এই চাষাবাদের প্রাথমিক স্তরেও এইভাবে কাজে লাগানোয়। আবার এইসব দেখার পর এও মনে হয়েছে যে এর জন্য আবার 'বিপ্লবের' দরকার কেন? এই চাষীগুলোতো দেখছি কোনওরকম 'বিপ্লব' না করেই দিব্যি চারিদিক সব সবুজে-সবুজ করে দিয়েছে! এইসবের কোনো কিছুর জন্যই যে কোনো রকম বিপ্লবের দরকার হতে পারে তা নিশ্চয় এদের ধারণার বাইরে। এই চাষীদের অনেকেই মহিলা।

ক্ষেতের ফসল ছাড়াও এদের থাকে 'লাইভ-স্টক' - গোরু, ভেড়া, শূয়োর, মুরগী এইসব। ফসল ফলানোর কাজ গ্রীষ্মকালের মধ্যে শেষ হলেও এই 'লাইভ-স্টক' সংক্রান্ত কাজ চলে সারা বছর। তবে এইসবের অনেক কিছুই করা হয় কৃত্রিম উপায়ে। যেমন ষাঁড়ের সাথে গাভীর 'মিলন' চাষীদের না-পসন্দ (গাভীদের রাখা হয় আলাদা খোঁয়াড়ে)। অথচ গাভীরা সারা বছরই অন্তসত্তা! বেশ বড়সড় সিরিঞ্জ, যাতে কোরে চাষীরা ষাঁড়ের থেকে বার করা স্পার্ম (দোকানে কিনতে পাওয়া যায়) ঢুকিয়ে দেয় গাভীর শরীরে। এই গাভীদের কথা ভেবে আমার খারাপ লাগে। মিলন-সুখ যে কি জিনিস তা এরা জানতেও পারে না, শুধু জানে প্রসব-যন্ত্রণা। আর যখন প্রসবে আসে অক্ষমতা, তখন এদের নিয়তি কারোর রান্না-ঘরের পথে। শূয়োর, ভেড়ার ক্ষেত্রেও একই ব্যবস্থা। পুরুষ আর মহিলা ভুট্টা, বিন বা সূর্যমুখী ফুলের 'মিলনও' নৈব নৈব চ; এদের ফলনের পিছনে থাকে জেনেটিক-ইঞ্জিনিয়ারিং! গোরুর দুধ দোয়ানো হয় মেসিনের সাহায্যে, পাম্পের মাধ্যমে যা সোজা চলে যায় 'ঠাণ্ডা'-ঘরে। দুধে যে জল মেশানো যেতে পারে তা শুনলে এরা হয় হাসবে, নইলে মান-হানির মামলা করবে (কারণে-অকারণে মামলা রুজু করতে এরা আবার ওস্তাদ)। লাইভ-স্টক দেখাশোনা করার চাষীদের সাধারণত বলা হয় 'ডেয়ারি-ফার্মার' বা 'পোল্ট্রি-ফার্মার'; যাদের মুল কাজ হয় দুধ, ডিম বা মাংস সংক্রান্ত - শস্য নিয়ে নয়।

চাষীদের খামারগুলো সাধারণত হয় পরিবার ভিত্তিক, বংশ পরম্পরায় তা হস্তান্তরিত হয় পুরুষানুক্রমে। একই চাষী পরিবারে এমনটা দেখতে পাওয়া একেবারেই বিচিত্র নয় যেখানে পরিবারের সকলেই চাষাবাদের কোনও না কোনও বিষয়ে ইউনিভার্সিটির স্নাতক - হয়তো বাবা ভুট্টা সংক্রান্ত জেনেটিক-ইঞ্জিনিয়ারিঙয়ে, মা ডেয়ারি-সায়েন্সে আর ছেলে মেকানিকাল-ইঞ্জিনিয়ারিঙয়ে। স্বভাবতই বাবার কাজ শস্য ফলানো, মায়ের কাজ দুধ দোয়ানো (মেসিনের সাহায্যে), আর ছেলের কাজ বাবা-মায়ের কাজের কল-কব্জাগুলোকে চলনসই রাখা। খামারের সামগ্রিক ধারণা হোল যে খামারে বেড়ে না উঠলে খামার ধরে রাখতে পারা বা খামারের কাজ করা প্রায় অসম্ভব। অর্থাৎ, ডাক্তার বাবা-মার বাড়িতে বড় হওয়া কেউ হঠাৎ কোরে এই সিদ্ধান্তে আসতে পারে না যে সে চাষী হবে (অ্যামেরিকান সমাজে চাষী হওয়া বা ডাক্তার হওয়ার মধ্যে খুব একটা ফারাক নেই, দুটোই প্রায় সমান সন্মানজনক জীবিকা)। এর আবার একটা মর্মান্তিক দিকও আছে, যেমন 'ডিভোর্স' - যখন 'ওলসন' পরিবারের মেয়ে 'স্মিথ' পরিবারের খামারে বৌ হয়ে আসার পর ডিভোর্স চায়! পুরুষানুক্রমে তিল-তিল কোরে গায়ের রক্ত জল কোরে গড়ে তোলা স্মিথ-খামারের একাংশ তখন চলে যায় 'ওলসন' পরিবারের মেয়ের জিম্মায়, যে হয়তো চাষাবাদের কিছুই জানে না। তবে এই মর্মান্তিক পরিণতিতেও কোনো রকম মারামারি বা খুনোখুনির কথা কোনওদিন শুনিনি; এরা সভ্য, ডেমোক্রেসিতে এরা বিশ্বাস করে - কোর্টের রায়কে এরা মেনে নেয়, তা সে এমনিই হোক বা অ্যানটাই-ডিপ্রেসেন্ট বা মদ খেয়ে হোক।

তবে অবশ্যই আছে 'ননীতে চোনা' - একটু খোঁজ নিলেই জানা যায় যে এদের এই খামারগুলোতে এই চাষীর বৌয়ের সাথে ঐ খামারের ঐ চাষীর ভাইয়ের, ঐ খামারের ঐ চাষীর বাবার সাথে সেই খামারের সেই চাষীর মায়ের এমন সব জটিল সম্পর্ক আছে যা আবার আমরা কোলকাতায় বসে ভাবতেও পারবো না। বলা যেতে পারে যে এদের প্রায় প্রত্যেকেই প্রত্যেককে চেনে 'বেশ গভীর' ভাবে। ঐ গোরু-ভেড়াদের 'না-মিলন' সুদে-আসলে পুষিয়ে দেয় খামারগুলোর চাষী পরিবারের সদস্যরা। ক্ষেতে শস্য উৎপাদনের সাথে তালে তাল মিলিয়ে চলে খোঁয়াড়ে গোরু-ভেড়া-শুয়োরের উৎপাদন আর খামার পরিবারে শিশু উৎপাদন। বলা বাহুল্য যে এই শিশুদের জিন-পুলের রকম-ফের ঐ শূয়োর-সূর্যমুখী বা ভেড়া-ভুট্টাদের তুলনায় বেশ কম।

ভরা ক্ষেতের সবুজ আর হলুদের সমারোহ দেখতে আমার বেশ লাগে, দেখলেই মনে হয় যেন রং-তুলি নিয়ে বসে পড়ি, আর এর খানিকটাকে কাগজের 'ফ্রেমে' বন্দী করে রেখে দিই নিজের কাছে। অগাস্ট-সেপ্টেম্বরের ছুটির দিনের দুপুরগুলোয় যদি কখনো 'একা' লাগে, তখন একাই বেড়িয়ে পড়ি; 'লং' নয়, 'শর্ট-ড্রাইভে' - শহর ছাড়িয়ে। ভরা ক্ষেতগুলো দেখলে মনটা ভালো হয়ে যায়, তখন আবার বাড়ি ফিরে আসি, সাথে নিয়ে আসি ওদের খানিকটাকে 'বন্দী' করেই – কিছুটা আমার ক্যামেরার ফ্রেমে আর বাকীটা আমার মনের ফ্রেমে। ■

স্মৃতি বিস্মৃতি

- মঞ্জুলিকা হানারি (দাশগুপ্ত)

জীবনের পটে অন্তহীন ঘটনার স্রোত নানা রঙের ছবি এঁকে চলে অবিরাম আর সময় তার আপন খেয়ালে সে রঙিন পটরেখা মুছে ফেলে বারবার। শুধু মনের গহনে স্তব্ধ হয়ে থাকে সমষ্টির জীবনের নীরব উপস্থিতি। আজ অবসরক্ষণে থেকে থেকে মন হারিয়ে যেতে চায় স্মৃতির নেশায়। ফেলে আসা দিনগুলির আবেশ-ভরা পিছু ডাকের টানে এক লহমায় পৌঁছে যায় সেই স্বপ্নমধুর দিনগুলিতে। মনের পর্দায় ভেসে ওঠে কত চেনা মুখ, ভুলে যাওয়া কত আনন্দ মুহূর্ত। মনে পড়ে যায় কত কথা, কত ঘটনা। জাপানে এসে দেখতে দেখতে কেটেও তো গেল চার চারটে যুগের বেশী। দেখলাম কত বৈচিত্রময় চরিত্র। আলাপ-পরিচয় হল কত মানুষের সঙ্গে। তাদের কিছু বিখ্যাত, আবার বেশীত্র ভাগই অখ্যাত। তারই মধ্যে কোনও কোনও মানুষের সঙ্গে শুধুই দেখা, মৌখিক আলাপ। কারও সঙ্গে সামান্য পরিচয়ে প্রাণের সখ্যতা। আবার কিছু মানুষের অযাচিত স্নেহ-ভালোবাসায় আপ্লুত মন-প্রাণ বাঁধা পড়েছে চিরঋণে। আজ কুয়াশাচ্ছন্ন স্মৃতির অলিতে গলিতে হোঁচট খেতে খেতে দেখি সেখানে কত আকস্মিক আর চমকপ্রদ ঘটনার ভীড়। আর তারই একটি হল বিয়াল্লিশের অগ্নিকন্যা অরুণা আসফ আলীর সঙ্গে আলাপ হওয়া। ভাবতে অবাক লাগে কি অদ্ভুতভাবে হঠাৎই দেখা হয়ে গিয়েছিল ওঁর সঙ্গে এই টোকিয়োর রাস্তায় – একেবারে আমাদের পাড়াতে। সে কি আজকের কথা? তবু আজও ভুলতে পারিনা সেই দিনটাকে।

১৯৬৪ সালের কথা। আমরা তখন থাকি কোওজিমাচিতে পুরনো আমলের কাঠের দোতলা বাড়ীর একতলাতে। সে সময় জাপানে এ ধরণের বাড়িই বেশী ছিল। কোওজিমাচি টোকিয়োর এক প্রাচীন আর অভিজাত পাড়া – তখন তো নিশ্চই, এখনও। আমাদের বাড়িটাও ছিল তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পাড়ার মধ্যে সব থেকে পুরনো। আর তা এতই পুরনো যে টুকটাক সারানোর কাজ সব সময়ই লেগে থাকতো। আমাদের বাড়ীওয়ালার আবার এ বাড়ীর পিছনে একটা পয়সা খরচ করতেও প্রচণ্ড আপত্তি ছিল। অগত্যা আমরা ছুটিছাটার দিনগুলিতে সে কাজটা যতটা সম্ভব নিজেরাই করে নিতে চেষ্টা করতাম। নেহাৎ না পারলে লোক ডাকিয়ে নিজেদের খরচেই তা করা হোত।

যাহোক সে দিনটাও তেমনই একটা রবিবার ছিল। সকাল থেকে প্রচুর কাজ নিয়ে তার শুরু। সময়টা অগাষ্ট মাস – গরমকাল। মনে আছে প্রচণ্ড গরম ছিল দিনটা। তবে তখন এখনকার মত গরম পড়ত না। তাই আজকের মতন ঘরে ঘরে এ.সি তো দূরের কথা, পাখাও সব বাড়ীতে ছিল না। ভাবটা ছিল- মাত্র একটা মাসের জন্য খরচ বাড়িয়ে লাভ কি? হাত পাখাই তো যথেষ্ট। আমাদের বাড়িও তার ব্যতিক্রম ছিল না। কাজেই সেদিনের গরমে শরীরের আনচান অবস্থা। নতুন দেশে প্রথম গরমকাল। সারাদিন ঘরে বসে কাজ করার পর একটু খোলা জায়গায় বেরোবার জন্য মন তখন ছটফট করছে। কিন্তু হাজার সাধ্যসাধনা করেও ক্লান্ত 'কত্তামশাই'কে রাজী করাতে পারলাম না। ওদিকে আমার জাপানী ভাষাটা তখনও তেমন রপ্ত হয়নি যে একা একা একটু এদিক ওদিক ঘুরে আসবো। আর একা একা ঘুরে বেড়াতে কারই বা ভালো লাগে? তার উপর নতুন অচেনা যায়গায়। আমার ছোট ননদ মিয়ো তখন থাকে আমাদের কাছে। আমার অবস্থা দেখে শেষ পর্যন্ত সে রাজী হোল আমার সাথে বেরতে। দমে যাওয়া মনটা মুহূর্তে খুশীতে ভরে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে তাকে নিয়ে বেড়িয়ে পড়লাম।

কোওজিমাচি – ইয়োৎসুইয়া অঞ্চল তখনও অনেক ফাঁকা। বাড়ীর সামনের বড় রাস্তা দিয়ে বাসের সঙ্গে ট্রাম চলে বহাল তবিয়তে। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। পাড়ার হাতে গোনা দোকানগুলি রবিবার বলে বন্ধ। বেশ নিঝুমভাব। শুধু মাঝে মধ্যে বাস বা ট্রাম, কখনও বা গাড়ী সশব্দে ছুটে যাচ্ছে নিস্তব্ধতাকে খান খান করে। পথ ঘাট প্রায় জনশূন্য। আমরা কথা বলতে বলতে বাড়ীর কাছের ইয়োৎসুইয়া স্টেশনের কাছাকাছি এসেছি। মিয়ো হঠাৎ বলে উঠলো "ঐ দ্যাখো তোমার দেশের লোক"। তাকিয়ে দেখি শাড়ীপরা একজন ভদ্রমহিলা চার পাঁচজন ভদ্রলোকের সাথে স্টেশন থেকে বেড়িয়ে আসছেন। দেশী মানুষ দেখে মনটা খুশীতে নেচে উঠলো। সে সময় ভারতীয় মানুষতো দূরের কথা পথে ঘাটে বিদেশীও খুব একটা দেখা যেত না। আমি তখন সবে দেশ ছেড়ে এসেছি। বাড়ীর জন্য মন কেমন করে সব সময়ই। তার উপর পাড়ায় একমাত্র বিদেশিনী হবার দৌলতে সকলের অন্তহীন কৌতূহলের পাত্র- যেন অন্য কোন গ্রহের জীব। সেই সঙ্গে ঘরে বাইরে বিদেশী ভাষা বলতে বলতে আমি ক্লান্ত। সব মিলিয়ে এখানকার জীবনের সঙ্গে মানিয়ে নিতে রীতিমতন যুদ্ধ করছি। তাই দেশী মানুষ দেখলেই মনে হত কত আপনজন। কথা বলার জন্য অস্থির হয়ে উঠতাম। ছুটে যেতাম আলাপ করতে। সকলে যে তা পছন্দ করতেন তা নয়। তবু নিজেকে ধরে রাখতে পারতাম না। এদের দেখেও আমার একই অবস্থা। কি করবো ভেবে পাচ্ছি না। নানান চিন্তা মনের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে আর আমি 'ভাবলা' হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। ইতিমধ্যে ওঁরাও আমাদের দেখেছেন বুঝলাম। অবাক হয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে সকলে। নিজেকে সামলাবার আগেই দেখি দলের একজন আমাদের কাছে নমস্কার করে নিজের পরিচয় দিয়ে জানালেন ওঁরা দিল্লি থেকে এসেছেন। প্রতি নমস্কার জানাতেই জিজ্ঞাসা করলেন "আপনি কি বাঙালী?" হ্যাঁ বলতেই বললেন, --"আপনি অরুণা আসফ আলীর নাম শুনেছেন নিশ্চই। উনি সেই অরুণা

আসফ আলী। আপনাকে ডাকছেন।"

নামটা শুনেই চমকে উঠলাম। ঠিক শুনলাম তো? নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিনা যেন। দেশে থাকতে যাকে দেখার জন্য উন্মুখ হয়ে ছিলাম কিন্তু দেখা পাইনি বা সুযোগ হয়নি দিল্লী থাকতেন বলে, আজ তিনিই কিনা সাতসমুদ্দুর পারের বিদেশী এই শহরে আমার চোখের সামনে দাঁড়িয়ে ! আর শুধু তাইই নয় কথা বলার জন্য ডাকছেন। বিহ্বল আনন্দে আমি আত্মহারা। কয়েক মুহূর্তের জন্যে সবকিছু তালগোল পাকিয়ে আমি কেমন যেন অনুভূতিহীন হয়ে পড়লাম। চমক ভাঙ্গলো ভদ্রলোকের কথায়। সঙ্গে সঙ্গে একটা সঙ্কোচ মনটাকে ঘিরে ধরলো। স্বপ্নের মানুষের সঙ্গে কি কথা বলবো? একটু দ্বিধা, তারপরেই মোহাবিষ্টের মতন ওর সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। প্রণাম করতেই সস্নেহে জড়িয়ে ধরে মিষ্টি হেসে বললেন, "দেখেই বুঝেছি বাঙালী। নাম কি?" বললাম নাম। আমার ননদ মিয়োর সঙ্গেও আলাপ করিয়ে দিলাম। খুব খুশী হলেন। জিজ্ঞাসা করলেন অনেক কথা – শ্বশুরবাড়ীর লোকেরা কেমন, আমাকে মেনে নিয়েছেন কিনা, আমি খুশী কিনা ইত্যাদি ইত্যাদি আরও কত কি! প্রশ্নের উত্তর দিতে না দিতেই বলে উঠলেন, "মেয়ে তোমার সাহস তো কম না? সব ছেড়ে ছুড়ে এই দূর বিদেশে একা একা চলে এলে, ভয় করলো না ?"

বলেই হাসতে লাগলেন। লজ্জা পেলাম ওঁর কথায়। আমার কত আগে উনি তো অনেক বেশী সাহসের কাজ করেছেন। সে কথা আর মুখ দিয়ে বেরোল না। আমি শুধু অবাক বিস্ময়ে দেখছি তাঁকে। স্নিগ্ধ, ব্যক্তিত্বপূর্ণ ছোটখাটো চেহারা, অথচ কি সহজ আপন-করা ব্যবহার। কল্পনার মানুষটির সঙ্গে এতটুকু অমিল নেই কোথাও। রাস্তায় দাঁড়িয়েই কথা হোল কিছুক্ষণ। খুব ইচ্ছা থাকলেও ছোট অগোছালো ঘরের কথা চিন্তা করে বাড়িতে ডাকতে আর সাহস পেলাম না। কথায় কথায় জানলাম ওঁরা হিরোশিমাতে শান্তি সম্মেলনে এসেছিলেন। ফেরার পথে টোকিয়োতে কয়েকটা মিটিং-এ যোগ দেবার জন্য দিন কয়েক থাকবেন। উঠেছেন কাছেই ফেয়ারমন্ট হোটেলে। বিদায় নেবার আগে বললেন, "কাল সকালে পারলে হোটেলে চলে এসো। কালকের দিনটা সারাদিন খালি আছে। এরা সব সকালবেলা বাজারে বেরিয়ে যাবে। শরীরটা খুব একটা ভালো নেই, তাই আর বেরোবনা

– ঘরে থাকবো। একা একা সময় কাটানো বড় মুশকিল। তুমি এলে গল্প করা যাবে। আসবে তো?”

আমি তখন ঝাড়া হাত-পা। কাজেই অসুবিধা কিছু ছিলনা। তার উপর স্বপ্নের মানুষের ডাক এড়াই কি করে? কথা দিয়ে ঘরে ফিরলাম একটা ঘোরের মধ্যে। এই ক'ঘণ্টায় আমার জীবনের সব বুঝি ওলোটপালট হয়ে গেল। সেদিন রাতে চোখে ঘুম নেই। স্মৃতির ছায়াপথ ধরে মনটা চলে গেছে সেই সময়টাতে যখন সব না হলেও একটু একটু বোঝার মতন কিছুটা বড় হয়েছি। সেদিন সাধারণ মানুষের মন জুড়ে শ্রদ্ধার আসন নিয়েছেন স্বাধীনতা সংগ্রামের বিপ্লবীরা। বিশেষ করে “অগ্নিকন্যা”দের বেলায় সেই শ্রদ্ধার সঙ্গে মিশেছিল অপার বিস্ময়। এরা যে পথ ধরেছিলেন তা ঠিক কি ভুল, তা নিয়ে মতভেদ নিশ্চই আছে, তবে একথাও ঠিক যে অনেকের চোখে এঁরা ছিলেন অতি মানবী, বিশেষ শক্তির অধিকারিণী। তাই তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা বা ভয় হয়ে উঠেছে আকাশছোঁয়া।

এই সব “অগ্নিকন্যা”দের অনেককেই খুব কাছ থেকে দেখার সৌভাগ্য হয়েছে নানাভাবে বার বার। তাঁদের আপাদমস্তক অতি সাধারণ ঘরোয়া চেহারা দেখে অবাক বিস্ময়ে খুঁজতে চেষ্টা করেছি তাঁদের সেই অসীম সাহসী রূপ। মেলাতে চেয়েছি শোনা গল্পের সঙ্গে। সেই অবাক বিস্ময়ই ক্রমশ শ্রদ্ধা ভালোবাসার বিশেষ একটা রূপ নিয়ে মনের মধ্যে নিজের একটা যায়গা করে নিয়েছে চিরকালের মতন। অনেককে দেখলেও একজনকে দেখার জন্য আমি উৎসুক ছিলাম সব সময়ই। নাম তাঁর অরুণা আসফ আলী। কিন্তু তাঁর নামটাই শোনা ছিল শুধু, চোখে দেখার সৌভাগ্য আর হয়নি। ওঁর সম্বন্ধে আমার কৌতূহলের শেষ ছিলনা কোনও। নামটা ছোটবেলা থেকেই টানতো। এই নামের মধ্যে কোথায় যেন একটা অন্য সুর – আর সকলের মতন নয়। হয়তো চেনা নামের সঙ্গে একটা অচেনা পদবীটাতে এমন কিছু ছিল যা আকৃষ্ট করেছিল আমাকে। বালিকা মনে অনেক কল্পনা-জল্পনার খোরাক জুটিয়েছেও। অনেক পরে সব বোঝার মতন বয়স হলে বুঝেছি যে ওঁর বিপ্লবী রূপের থেকেও বিদ্রোহিনী রূপটার প্রভাব আমার মনের মধ্যে বেশী কাজ করেছে।

ভাবতেও রোমাঞ্চ লাগে মাত্র ১৯ বছর বয়সে অরুণা গাঙ্গুলী বিয়ে করে ফেললেন আসফআলীকে। ওঁদের পরিবার ব্রাহ্ম ছিলেন একথা ঠিক। আর যে কারণে সাধারণ হিন্দু সমাজের তুলনায় অনেক বেশী উদারমনা, আধুনিকাও। তবু সেই যুগে একজন মুসলমানকে বিয়ে করতে কতখানি সাহস আর মনের জোরের প্রয়োজন তা আজকের অপেক্ষাকৃত উদার সামাজিক পরিবেশে দাঁড়িয়েও অনুমান করাটা কঠিন নয়। ওঁর এই বেপরোয়া সাহস আমার মনে চিরকাল সম্ভ্রম জাগিয়েছে, ভাবিয়েছে, অবাক করেছে। হয়তো বা নিজের পথ বেছে নিতে পরোক্ষে প্রেরণাও দিয়েছে। সেই মানুষকে চোখের সামনে দেখে, কথা বলে আমি আনন্দে, উত্তেজনায় রাতের ঘুম ভুলে সেই ভাল লাগাটা তারিয়ে তারিয়ে অনুভব করে চলেছি নিজের মধ্যে। রাতটা প্রায় জেগেই কাটলো বলতে গেলে।

সকাল হতেই ঘরের কাজ কোনরকমে সেরে ছুটলাম হোটেলে। গিয়ে দেখি একা একা চুপ করে বসে আছেন লবিতে। সারা মুখে ক্লান্তির ছাপ স্পষ্ট। সঙ্গীরা সব বেরিয়ে গেছেন কেনাকাটা করতে। জাপান তখন সস্তার দেশ। অনেককেই তখন দেখেছি শুধু বাজার করতে জাপান ছুঁয়ে যেত।

সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই তাড়াতাড়ি উঠে আমার হাতটা এমন মমতাভরে জড়িয়ে ধরলেন যেন কতদিনের পরিচিতজনকে কাছে পেয়েছেন। হেসে বললেন – “এসেছো? তোমার কথাই ভাবছিলাম বসে বসে। এসে বসো আমার পাশে।“ পাশে গিয়ে বসলাম। অনেক কথা; অনেক গল্পের মধ্যে বেরলো উনি আমাদের বাড়ীর অনেককেই চেনেন। এর পরে তো কথা বলা আরোই সহজ হয়ে গেল। কথার ফাঁকে ফাঁকে কত লোকের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। ওঁর ক্লান্তির কথা ভেবে যখনই বাড়ী ফিরবো বলে উঠতে গিয়েছি তখনই হাত ধরে বসিয়ে দিয়েছেন”আর একটু বোসো” বলে। শেষপর্যন্ত সারাদিন কাটিয়ে ভরা মনে ঘরে ফিরেছি। যে কটা দিন ছিলেন রোজ গিয়েছি ওঁর কাছে ওঁর অনুরোধে। কত কথা বলেছেন। আজ আর সব কথা মনে পড়েনা বলে ক্ষোভ হয়। ওঁকে যত দেখেছি, যত কথা বলেছি, ততই মুগ্ধ হয়েছি। ওঁর শান্ত স্নিগ্ধ অথচ ব্যক্তিত্বপূর্ণ চেহারা ওঁকে সকলের থেকে আলাদা করেও দূরে সরিয়ে দেয়নি। আমার মতন সম্পূর্ণ অজানা অচেনাকেও কত সহজে কাছে টেনে নিয়েছেন। উজার করে দিয়েছেন স্নেহ ভালোবাসা। কোন ফাঁকে যে সম্পর্কটা মাত্র কদিনেই সহজ হয়ে উঠেছিল বুঝতে পারিনি।

অপ্রত্যাশিতভাবে এত পেয়েও মনের মধ্যে আজও একটা অতৃপ্তি রয়ে গেছে আমার। কারণ যা জানার আগ্রহ আমাকে তাঁর প্রতি চিরদিন আকৃষ্ট করেছে তা আর জানা হয়নি। সুযোগ যখন এলো তখন সঙ্কোচে মুখে কথা ফোটেনি। ফলে মনের প্রশ্ন মনেই রয়ে গেল চিরদিনের মতন। তবে একথাও ঠিক যে উনি নিজে ডেকে ডেকে আলাপ না করলে, এত কাছে টেনে না নিলে কোন দিনই আর ওঁকে এমনভাবে জানতে পারতামনা – স্বপ্নের মানুষ স্বপ্নেই থেকে যেতেন। তাই ওঁর স্মৃতি আরও অনেক সুখ স্মৃতির সঙ্গে আমার অবসরক্ষণের সঙ্গী হয়ে থাকবে আজীবন।। ■

সারমেয় কথা

- আলপনা ভট্টাচার্য

গতকাল টি,এম,এইচ (টাটা মেইন হসপিটাল) থেকে রেকী সেরে বাড়ি ফেরার পথে এক অপরূপ দৃশ্যে মন ভরে গেল। ইতিপূর্বে এই দৃশ্য অন্তত আমি কখনও দেখিনি । এক সঙ্গে ১৮/১৯টা কুকুর দেখেছি, কিন্তু ২৯টা কুকুর সঠিকভাবে সারিবদ্ধ হয়ে হাঁটছে --- এ আমি কখনও দেখিনি। দেখে মনে হোল আমরা যেমন মিছিলে যাই, ঠিক সেই রকম, তবে আমরা বোধহয় এত সুশৃঙ্খলভবে যাই না। সারমেয়দের শৃঙ্খলা শেখাবার কোনও শিক্ষালয় খোলা হয়েছে বোধহয়! আমি বেশ কিছুক্ষণ গাড়ি থামিয়ে এই দৃশ্য দেখি এবং অবশ্যই পুলকিত হই।

বাড়ি ফিরতে ফিরতে অনেক পুরোনো কথা মনে পড়ল । পশু-প্রেমীরা আমার লেখাটি পড়ে অসন্তুষ্ট হবেন না। আমাদের বাড়ির গায়ে লাগানো রাও বাবুদের বাড়ি। ওনার ছোট মেয়ে নির্মলা বাড়িতে বিউটি পার্লার খুলেছে। মেয়েটি চারটে কুকুর পুষেছে। নির্মলা ওর কুকুরগুলোকে খুবই যত্ন করতো। একদিন আমি আমার টিউশন ক্লাসের ছাত্রদের পড়াচ্ছি, এমন সময় নির্মলা ভয়ঙ্কর চিৎকার করে আমাকে ডাকতে লাগলো। ওর বাবা মা বৃদ্ধ হয়েছেন, ওর ডাকাডাকিতে ভয় পেয়ে আমি বারান্দায় বেরিয়ে এসে হতভম্ব হয়ে গেছি । আমাকে দেখা মাত্র ওর সামনে দাঁড়ানো ভদ্রলোককে দেখিয়ে বলে উঠলো, 'দেখিয়ে না দিদি, ইন্‌হোনে মেরি সুজী কো কুত্তি বোলে হৈঁ, গালি দিয়ে হৈঁ'। আমি বোকার মত বলি, 'উনকো তেরি সুজী কা নাম মালুম নেহি হৈঁ, ইস লিয়ে কুত্তি বোলে হোঙ্গে'। ব্যাস, ওর কান্না দ্বিগুণ হোল, 'আপনিও সুজী কে কুত্তি বলছেন? ওকে এইভাবে অপমান করবেন না, ও একটা মানুষ, একথা ভুলে যাবেন না'। আমি চম্‌কে উঠি সুজীর মনুষ্যত্ব প্রাপ্তিতে। চম্‌কালেও নির্মলাকে জ্ঞান দেওয়ার লোভ সামলাতে পারলুম না। বলি, 'দ্যাখ, আমাকে কেউ কুত্তি বললে আমার যতটা খারাপ লাগবে, সুজীকে মানুষ বলায় ওর হয়তো ততটাই মন্দ লাগবে --- এজন্য রাগ কেন করছিস্? তুই নিজেই বলিস কুকুর মানুষের থেকে ভাল, আমার সঙ্গে কত তর্ক করিস, আর সেই তুই বলছিস তোর সুজী মানুষ'। এই কথায় নির্মলা একটু শান্ত হোল। বোকা আমি জ্ঞানী সাজার আকাঙ্খায় বলে ফেলি, 'সুজী কথা বলতে পারে না, তাই কোনও প্রতিবাদ জানায় না'। মুহূর্ত মাত্র দেরী করে না নির্মলা, 'দিদি, সুজী আমাদের সব কথা বুঝতে পারে'। আমি স্বীকার করি কুকুরও আমাদের ভাষা বোঝে। আমাদের সিল্কিও রাত ৯টা বাজামাত্র সিরিয়াল দেখার জন্য টিভি'র সামনে লাফাতো। যাইহোক, দুজনে সুজী এবং সিল্কির গুণপনার কাহিনী বর্ণনায় মত্ত হয়ে উঠি। অবশেষে সুজী বেশী বুদ্ধিমতী, এই কথা স্বীকার করে ক্লাসে ঢুকি প্রায় পনেরো মিনিট পরে।

এবারে আরেক পরিবারের কুকুর প্রীতির কথা নিবেদন করতে চাই। আমাদের বিয়ের পরে আমরা আসানসোলে থাকতুম। আমার তখন বয়স কম, পাড়াতুত দুই মাসীমা অনেক খবরদারি করতেন আমার ওপর। এনারা পরস্পরের সঙ্গে কথা বলতেন না, একটা ঠাণ্ডা লড়াই চলতো দুজনের --- কুকুর সংক্রান্ত কিনা জানিনা। দুই মাসীমার একজন ছিলেন রায় মাসীমা। এনার চারটে নেড়ি কুকুর ছিল। তাদের নাম টমি, জিজো, ভিক্টো ও ফ্যান্সি ছিল। ওনারা কুকুরদের সঙ্গে ইংরেজিতে কথা বলতেন। এই পরিবারে দুটো অ্যালসেশিয়ান কুকুরও ছিল। কুকুর দুটোকে ওনারা জগা, মগা বলে ডাকতেন। পাঠক, বিশ্বাস করুন, জগা আর মগা ডাল, ভাত, ডাঁটা চচ্চরি খেত, মাঝে মধ্যে দৈ এবং ছানার তরকারি। আমার দেওর একদিন আমাকে বললো, 'তোমার রায় মাসীমাকে জিজ্ঞাসা করবে তো ওনার নেড়িদের নাম টমি, জিজো আর অ্যালসেশিয়ান দুটোর নাম জগা মগা কেন? রায় মাসীমা তার কুকুর প্রসঙ্গ পেলে দুনিয়া ভুলে যেতেন। আমি তাই স্বেচ্ছায় কুকুর প্রসঙ্গে যেতুম না। তবু একদিন 'জয় মা' বলে প্রশ্নটি করলুম। মাসীমা জানালেন, 'নেড়ি কুকুরগুলো ইংরেজ জাতিভুক্ত, তাই ওইরকম নাম দিয়েছি এবং হাড়মাংস খায়, মিছিমিছি মেজাজ হারিয়ে চেঁচায়, মানুষ এবং অন্যান্য জীবকে আক্রমণ করে'। ওনার কথা শুনে বাক্‌রুদ্ধ আমি। আমি অন্য কিছু বলার আগেই উনি বললেন, অ্যালসেশিয়ানদের সাহস তেজ আমাদের মত, তাই ওদের জগা মগা বলেন। এই কথা শুনে হতবাক হয়ে আমার শরীর খারাপ লাগতে লাগলো। দু-দুটো জাতিকে কুকুরের সঙ্গে কেউ তুলনা করতে পারে, কল্পনার অতীত ছিল, স্বজাতিকে কুকুর শিরোপা দেওয়ার মত কুকুর-প্রেমী কেউ কি কখনও দেখেছেন?

এবার আরেক মাসীমার কুকুর-প্রীতি পরিবেশন করতে চাই। এই মাসীমার কাহিনীটি অতি করুণ এবং অবাক হওয়ার মত। ওনার নাম ছিল মানা (অবশ্যই আসল নাম নয়)। অতি অসময়ে ওনার একমাত্র কন্যা মাত্র ১৬ বছর বয়সে ব্লাড ক্যানসারে মারা গেছিল। এই সন্তান-শোক ভুলতে উনি একটি অ্যালসেশিয়ান লালন-পালন করছিলেন। কুকুরটির নাম নিজের মেয়ের নামে রেখেছিলেন। কথাবার্তায় এই মাসীমা খুব স্বাভাবিক ছিলেন, কিন্তু উনি কুকুরটিকে পড়াতেন। হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান শেখাতেন। আমাকে ডাকতেন সেই গান শেখানো দেখার জন্য। বলতেন, 'রত্না দেখো আমার টুনি কি ভাল গান বুঝতে পারে, কেমন মাথা নাড়তে থাকে'। সতি বলছি আমি কোনও দিন কুকুরটির মাথা নাড়ানো বুঝতে পারিনি। উনি সম্ভবত হিজ মাস্‌টারস্ ভয়েস'এর কুকুরটির দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। ওনার কুকুর প্রসঙ্গে আমার বলার কিছু ছিল না, শুধু ভাবতুম ডাক্তাররা এই কুকুর পোষায় কেন বাধা দেননা, ১০-১২ বছর পরে কুকুরটি মারা গেলে মাসীমা তো পাগল হয়ে যাবেন। আমরা জামশেদপুরে চলে এলুম, শেষ পর্যন্ত ওনার কি হয়েছিল জানিনা।

আমার পিত্রালয়ে কুকুর ছিল, আমি নিজেও রেখেছি। আমাদের সিল্কিকে মানুষজন এলে 'নমস্কার' বলতে, থুড়ি নমস্কার করতে শিখিয়েছিলুম। আমাদের এক আত্মীয়ের বাড়ীতে ৯টা কুকুর ছিল। যখনই ওই বাড়ীতে যেতুম, ৯টা কুকুর (পামোরিয়ান ছিল) ভৌ ভৌ কিম্বা কৌ কৌ করতে করতে আমাদের দিকে মুখ রেখে নিজেরা ভেতরে চলে যেত এবং আমরা যখন বিদায় নিতুম, ৯টা কুকুরই আমাদের আগে সদর দরজায় পৌঁছে যেত এবং টা টা করতো। গৃহকর্ত্রী জানাতেন ওরা অতিথি এলে ভৌ ভৌ করে সাদর সম্ভাষণ জানায় এবং বিদায়কালে টা টা করে । বিদায়-বেলায় টা টা আমার সিল্কিও করতো, কিন্তু ওইরকম অপরূপভাবে সাদর সম্ভাষণ জানানোর ব্যাপার অন্য কোথাও দেখিনি।

কুকুর সকালবেলায় চা-বিস্কুট অনেক বাড়ীতেই খায়। আমাদের সিল্কিও খেত। আমার স্বামীর পান-জর্দা খাওয়ার অভ্যাস ছিল। ওনার মুখ থেকে পান কেড়ে নিয়ে খেত।

আমার কলম বন্ধ করার আগে আরেকটি ঘটনা বলি। আমাদের আরেক আত্মীয় প্রতি সন্ধ্যায় মদ্যপান করতেন। ওনার পোষা কুকুরটিও (ডোভারম্যান) ওনার সঙ্গী হোত। কুকুরটি বাড়ী কী পাহাড়া দিত কে জানে --- কিন্তু নেশার পর ওর রাজকীয় ভঙ্গিটি দেখার মত ছিল।।

সূত্রধর মাহাতো ও একটি উন্নয়নের সূত্র

- শংকর বসু

সূত্রধর মাহাতো উন্নয়নশীল দেশের কোণ ঘেঁষে থাকে
হাতের মুঠোয় তার বনপাহাড়ের গল্প দখল
উন্নয়নের সব সূত্রের লাটাই হাতে
নষ্টচন্দ্রের দলবল।

সুন্দরবন সেদিন বিক্রি হল সাপসদাগরের হাতে
পূর্ণিমার রাতে ঝিমন্ত চাঁদের আলোয়
আস্তানা হারালো কালো-হলুদ ডোরা আর
সূত্রধরের পূর্বপুরুষনারীরা
সঙ্গীসাথী ডানাওলা ঝট্‌পটে অথবা
নিছকই ডোডোপাখির মতো।

শালের জঙ্গলে তখন ঠিকাদারের আস্তানা
চোরাই কাঠ রাতে ডানা মেলে ওড়ে
পাথুরে খাদানের জমা জলে
সূত্রধর দেখে সেই উড্ডীন জঙ্গল, লালমাটি
টিলার ধারে পড়ে থাকা ছেঁড়া শাড়ীর আঁচল
নিম্‌কি সিম্‌কিদের অপুষ্ট দেহের বেসাতি শেষ অল্প দামে।

সাদা কুর্তার আড়ালে লুকোনো হাতের জাদুতে পাহাড়-জঙ্গলের
নক্সা লোপাট, দুধ-সাদা গাড়ীর আনাগোনা
নরম প্রেমের ছায়াছবির আউটডোর
ডাঞ্চিবাবুর দল, প্রাতঃভ্রমণ আর টাকা ওড়ার পত পত
সূত্রধরেরা কান পেতে শোনে; বেলপাহাড়ীর ধিক্কা মুর্মু
কবে শেষ ভাত খেয়েছিল সেকথা আজ ইতিহাস।

সাদা মানুষের হাতে ঢল নামে গুলি-বারুদের স্তূপ
সূত্রধরের সংশয় পিছলে পড়ে অন্ধকার উন্নয়নের সিঁড়িতে
বেলপাহাড়ী, সারঙ্গার মাটী নিজেদেরই রক্তবীজে আঁধারশিলা
ঝাপ্‌শা হয়ে যায় রঙ্গীন জীবন হে সূত্রধর, কে জাগে ?
যারা রইল বাকী, মরল দলছুট জন্তুর মতো
পাহাড়-জঙ্গলের রুক্ষ মাটীতে মাথাচাড়া দেয়
উন্নয়নের চারাগাছ
সূত্রধরের চালাঘর ফুঁড়ে
আরো অনেক উঁচু সাদা মেঘের দিকে॥

(Anjali 2010 সংখ্যায় প্রকাশিত লেখাটি পুনর্মুদ্রিত করা হয়েছে)

আধুনিক কবি

- বিশ্বনাথ পাল

ও পাড়ার শ্যাম নাকি আধুনিক কবি,
আধুনিক ছড়া লেখা শুনি তার Hobby ।
যে ছড়ায় মিল নেই, নেই কোনো ছন্দ,
তাতে নাকি ভরা থাকে আধুনিক গন্ধ ।।

আধুনিক ছড়া লেখা নয় মোটে সোজা,
তার চেয়ে শক্ত মানে তার বোঝা ।
তাতে ভরা থাকা চাই ভারী ভারী শব্দ।
যার মানে উদ্ধারে অভিধানও জব্দ ।।

যত বেশী হবে সেটা পাঠকের অবোধ্য,
তত নাকি উন্নত মানের সে পদ্য ।।

এমনই কঠিন ছড়া লিখলেই তবে,
আধুনিক কবি বলে সুখ্যাতি হবে ।।

আধুনিক ছড়া লেখা নয় মোর কর্ম,
সে কথাটা বোঝানোই কবিতার মর্ম ।।

(Anjali 2012 সংখ্যায় প্রকাশিত লেখাটি পূনর্মুদ্রিত করা হয়েছে)

প্রার্থনা

- নমিতা চন্দ

তোমার কাছে এ প্রার্থনা –
পরম দয়াময়
এক নিমেষেও আমার যেন
না হয় অপচয়।
সাগর জলে মুক্ত যেমন গড়ে গড়ে চলে,
তেমনি যেন তোমার কাছে
জীবন করি ক্ষয়;
এক নিমেষেও আমার যেন
না হয় অপচয়।
মৌমাছি মধুর স্বাদে যেমন ডুবে থাকে
তেমনি যেন তোমার ধ্যানে
ডুবোই হে আমাকে।
তোমার আমার আছে যে ভেদ
না হয় যেন কখনও ছেদ
খুঁজে যেন পাই হে তোমার পরম পরিচয়,
এক নিমেষেও আমার যেন
না হয় অপচয়।।

নব জীবন

- সুব্রত বণিক

আমায় 'নব জীবন' দিয়েছে যে রক্ত
সে কি দিয়েছ তুমি?
ছোট্ট দুটি হাতে জানাই তোমারে প্রণাম,
তব পদরেণু চুমি।
তোমারই মতো আরও অনেকে যারা
করেছে 'রক্তদান',
তাদের দানের রক্তেই বেঁচে গেছে
কত শত মানুষের প্রাণ।
রক্ত যায় না যে গড়া কোনও
রাসায়নিক এর গুণে,
অনেক মুমূর্ষু প্রাণ বেঁচে যেতে পারে
তোমাদেরই রক্তের দানে।
এক বোতল রক্তের অভাবে যখন
অকালে ঝরে যায় 'তাজা প্রাণ'
মানুষে মানুষে তখন
কিবা মান কিবা অভিমান।
রক্তদানের মহৎ যজ্ঞে আজ
হয়েছে যারা সামিল,
প্রণাম জানাই তাদের,
যাঁদের নেই তো জাত্যাভিমান,
রক্ত যে শুধুই লাল, হয় না কভু নীল।
আমিও যেদিন হবো তোমার মত বড়ো
করবো যে রক্ত দান
এভাবেই সেদিন জানাবো তোমারে প্রণাম
দেব তব দানের প্রতিদান।।

সংখ্যালঘু

- শান্তনু চক্রবর্তী

বসুধৈব কুটুম্বকম, বড়ই সহজ কথা
পরমাত্মা সবার উপর, দ্বিমত যে নেই সেথা
তবে কেন আত্মা বিশেষ, বিশিষ্ট পদ পায়
মন্দ এবং ভালো আত্মার যুদ্ধ বাধে হায়!

আত্মা যখন অনাত্মীয়, বিচার বুদ্ধি ব্রাত্য
অরাজকতা বিশ্ব জুড়ে, প্রাচ্য বা পাশ্চাত্য
কোথাও ব্রাত্য খাদ্য বিশেষ, কোথাও বা বেশভূষা
নিজ স্বার্থ সবার উপর, ব্রাত্য অমানিষা।

ট্রেনে সিটের দখল নিতে, প্রাণ এর দখল ছাড়া
গোমাতাকে করতে সেবা, সহজ যে প্রাণ হরা
ধর্ম যখন আছে সহায়, বাঁচাবে রাজনীতি
দেশের আইন ও প্রশাসনে নেই কোনো আজ ভীতি।

ধর্ম ভাব এর জিগির তুলে, অধর্মের রমরমা
রামরাজ্যের স্বপ্ন যে আজ ভাবের ঘরে জমা
এমন হাহাকারের মাঝে, চড়ছে দেশে ঘুঘু
অমানুষের ভিড়ে যে আজ, মানুষ সংখ্যালঘু।।

Mejo Jethu

- Tapan Das

My uncle Amar Babu, who happens to be my father's second elder brother, was a mining engineer by profession and remained a bachelor by choice till the end. We used to call him 'Mejo Jethu'. He loved two things with a passion: travelling to well-known and little-known places within the country and reading books on supernatural phenomena from around the world. He strongly believed in 'life after death' and the transfer of souls. He was our go-to person for advice on trips and vacations and entertainment—particularly in rainy evenings when, almost exclusively, ghost stories had to be heard. He worked at different government undertakings and departments throughout his career and retired from Barsua Iron Mines, at a non-descript hill town in remote Orissa.

Mejo Jethu lived in a posh quarter within the mining area surrounded by jungles and hills. Elephants, snakes and wild boars were some of the frequent visitors followed by deer and sambar at times. Sometimes, even leopards. The hill station was a calm, serene place to stay, conspicuously in contrast to the chaos and boisterousness of cities. On a cloudy day, if the windows were left open, clouds would just float indoors silently, without any invitation and would spray a heavenly shower on items and occupants inside a room.

Mejo Jethu was a brave and fiercely independent person. After retirement, he came to stay with us in our village but lived separately. On our insistence, he reluctantly agreed to have his meals with us whenever in town. I was always his favourite nephew. He would tell us tales of souls and life after death. He used to read a lot about 'planchette,' the transformation of souls, the power of 'tantra, mantra,' and similar things. He even told me how people like Rabindranath Tagore and many illustrious Bengalees of the time were attracted to planchette. He would often refer to an interview by Satyajit Ray to recount how it was only because of wishes of the departed soul of Sukumar Roy revealed through a planchette with Tagore that Tagore insisted that Satyajit Ray get enrolled in Shantiniketan, despite Ray's disinterest. His references to Tagore and other eminent Bengali personalities did have an effect of normalizing the idea, but still, we were far from convinced. Mejo Jethu's theory was simple. Addressing me affectionately as Tapu he said, 'Tapu, the soul never dies; it moves around until it finds a compatible and suitable body in a nearby womb possibly. Some researchers are of the opinion that first it looks forward to enter as a newborn within the close family if anyone was expecting. Otherwise, it tries to find its way into any expecting relative within the group of blood relatives. Otherwise, it prefers a womb based on a compatible body within the parameters of the makeup of genes.' He also thought it was not just genes that have a role to play on the behaviour, mannerisms, eccentricities and the mental makeup of a person, but soul as well. 'Mejo Jethu !! I do not believe in such theories of yours,' I would tell him, laughing. 'These are not my theories, child; these are some of the opinions of researchers and scientists,' Mejo Jethu would always reply patiently, as if tolerating my ignorance only out of affection and kindness of his heart. From what he theorized, I understood the soul to be following the FIFO rule. Like the Ola Uber cabs, the soul too reaches the nearest customer, maybe directed on the basis of geographical proximity.

'Jethu,' I said to him, 'I also fail to believe the story of a black snake standing a metre high on its tail. How is it possible, Jethu? I questioned him. And he would repeat his story and I would willingly listen to it with the thrills and anticipation of a first time listener, though I knew it by heart by now. 'Believe me, Tapu, I was returning on my Rajdoot motorcycle one late night and my friend was behind me .We just crossed the jungle area and at the bend, as we slowed down we saw something which sent shockwaves through our marrow. A black snake of around one-and-a-half metres long was standing straight on its tail and the headlight fell on its face. It looked similar to a black mamba. We parked the motorbike with the light still focussed on the reptile's face. I took a stick from the nearby bushes and struck a deadly blow on the waist and the reptile fell down. Two more blows and the snake lay lifeless. I burned the reptile and left the place.' Regardless of the degree of credibility that his stories offered, I used to yearn for more stories that defied common logic or science. 'Mejo Jethu, remember you told us about the lady you saw wearing a red saree in the dead of night with jewellery on and waiting on the road that you crossed? The next morning we heard that the dead body of the girl's father-in-law lay at that spot. It was rumoured that the girl had committed suicide a few days earlier owing to dowry harassment by the father-in-law and the soul of the girl took revenge on him.

Whatever it may be, what excited me was Mejo Jethu's animated style of delivering the stories. His actions, mannerisms, pitch and diction were just right and we enjoyed every bit of it. He only said what he himself believed in or about his inferences based on his own experiences. He always said that belief would come out of one's personal experience, and one only had to be open to receiving all kinds of experiences. His logic was simple: just because most people have not experienced it, the existence of supernatural was not disproved. He was very fond of me and whenever I had holidays or once every month I would go to visit him and he would come on his Rajdoot motorbike to get me home from the other side of the river. Our village was around 50 to 60 kms from the school hostel at Dasagram. Satishchandra Sarbarthasadhak Sikshasadan was my school by the way. There was just one motorable road running between, crossing some wooded area and some inhabited ones. Between the two places there was a big river known as Keleghai. This big river used to be in a foul mood at frequent intervals. Crossing the Keleghai was a horrifying experience each time. Most times, my uncle would wait for me on the other side of the river with his ever-dependable companion, the Rajdoot motorcycle, to pick me up or drop me off at that point. Keleghai was frequently in spate and was subject to raging high tides. The bamboo bridge built by the villagers was not reliable and often washed away by the strong current. The boats of the local fishermen were the only hope at times but even those were very uncertain at odd hours. Mejo Jethu would write letters to me frequently when I was in the hostel, using

inland letters and I sometimes replied using postcards.

One December, a particularly chilly one, the annual exams in my college had to be deferred twice due to bad weather. We were stuck between suspended exam and deferred break and therefore could not go home. We had to stay put at the hostel, waiting for the exams to begin. And anyway, going home was not a calming idea when you were panicking about exams. Anyway, finally the exams began and eventually I was left with only another week of exams. I had to let Jethu know that I was about to be done and coming home right after. My problem was: How do I let Jethu know about it? With not many options at hand, I just posted a postcard to him stating that he could come and pick me up the following Friday evening and wait on the other side of the river after 5.

On that Friday, it was raining since morning as usual and the examination went on well till 5 pm. As the bell rang, I rushed to the hostel to pack my bag while other hostel inmates were celebrating the end of the examinations and preparing to go to their respective places the next morning. I took permission from the warden and left. I began walking towards the Keleghai river. I couldn't wait to see my parents and Mejo Jethu and also my friends in the village after such a long gap. An umbrella saved me from the drizzle that did not let up and the feeble pencil torch was just sufficient to lead me in the growing darkness. Stories that I had heard from Mejo Jethu came back to me in a rush, putting my stomach in a knot. I tried to brush off any trickle of irrational fear telling myself that they were just stories and could never happen in real life. Only a handful of people were seen on the road in this inclement weather. There were no vehicles to be seen at all. The entire place seemed deserted. After walking for an hour I somehow reached the banks of the river Keleghai. The river was in spate and the bamboo bridge and the fishermen's boats were not to be seen. 'What do I do?' I thought to myself. The span of the river was so large that it would be difficult for me even to swim and that too at night. I began to panic but there was no one to help. I desperately hoped that Jethu would have received my letter and would be waiting for me.

In my despair, I tried to shout with all my might, in an effort to make my voice heard on the other side of the river: 'Mejo Jethu, are you there, there is no boat this side. . . are you there?' There was no reply for some time. Then suddenly I could hear the sound of a motorcycle and saw a beam of light pointed toward me. I instantly knew that this must be Mejo Jethu. The rain had become unbearable by now. I heard a voice suggesting that I wait. This too, I assumed, to be Mejo Jethu's. I followed the advice. I saw a small boat with a dim light approaching the bank. . . I was overjoyed. Once the boat reached, the boatman called out in a feeble voice, 'Come, Tapu babu, just step in. Mejobabu has sent me to take you across.' I crossed the river and thanked the boatman profusely. After walking for another five to seven minutes I reached the spot where the motorcycle was parked. Mejo Jethu was there wearing a raincoat. 'Tapu, come,' he said, 'let us get started. The weather seems to be getting uglier.' Indeed, the skies seemed to have burst and the sound of the rain almost deafened me. But now that I had crossed the river and would soon get home, I couldn't care less. I got onto the bike, held the umbrella and we started toward our destination. 'How were your exams?' he asked, his voice sounding distant. But I was too happy to care. I excitedly babbled my exam story.

The rain was really nasty. After an hour's drive we reached our village and it was pretty late. As we reached the main entrance of our house, I got down. Mejo Jethu handed over my bag to me and asked me to go inside so that he could park the vehicle and come. I happily ran towards the door and could see the rays of the lanterns burning inside. Knock, knock!! 'Ma, open the door. Tapu here.' 'Who is there at this odd hour?' I could hear Ma's voice. . . 'Tapu here, Ma'. 'Tapu!!' 'The door opened and I tightly hugged my mother. Tears rolled from my mother's eyes. She asked me to sit. The house seemed full. As I sat down, I saw relatives coming out of the rooms. I was surprised. Was there a get together or any event planned that I was not aware of?

'Ma, all our relatives are here. Why? Where is Baba?'

'Your Baba is fine. . . he has gone to the town this morning.'

'But why is everyone weeping and crying?' After sometime Ma broke the news to me: 'As your final exams were on we did not inform you, but ten days back your Mejo Jethu had expired and today was the tenth day ceremony . . .'

'What!! It cannot be true Ma . . .' I screamed and I rushed out of my house to find Mejo Jethu who drove me home. . . but no one was around. I rushed to the shed where the bike was kept and felt the engine. . . it was still very hot. In an instant I understood what had happened, and there were shivers down my spine. I could feel my heart racing up my throat and my knees wobbling! After all my refusals to believe in his claims of supernatural existence, a matter like this had to happen to me! I experienced proof in such a personal way that now there was no room to doubt anymore. Fear left me. Now it was awe. And calm. I knelt to the ground and bowed to Mejo Jethu. I cried to myself, 'Yes, Mejo Jethu, I believe your stories. By bringing me back home safely you proved your theory of life after death. May your soul find peace, Jethu. Come back to us when you are ready.' ■

Sail Set Sail

- Sougata Mallik

I have yet to turn towards the morning light,
Where the sorrows can no longer hide me.
I stand transfixed like a photo in black and white,
Where unknown voices are deep as the somber sea.

These wasteful tears have poisoned all my days,
And tortured my heart that's so afraid and frail.
I close my eyes to imagine all the peaceful ways,
That you and I can board our ship and set sail.

These living memories I know I cannot escape,
For they continue to hide my startled worried face.
I am clothed tightly in this gloomy dented cape,
That wraps my body with no breathing space.

Please set me free or else I may only steam,
Please set me free now - to dream the dreams I dream.

In the Moonlight

- Purnima Ghosh

Clear night sky! What a brilliant full moon!
Standing in the balcony, I'm enjoying the beauty alone.
See the lovely view of the calm and gentle moon.
See the harbor where endless waves dance on their own.

I can see the rooftops , the trees, and the wide sky,
I smell the aroma of Jasmine in the breeze.
It seems , environ is dressed up for the moon to satisfy;
Every one stands up for the moon to make her please.

Wherever I look, I see her majestic presence;
Billions of stars in her court, twinkle surrounding her.
Everything is blissful in nature, in peaceful ambience.
All odds become even by her magical touch whatever.

I 'm lost and breathless in the shower of moonlight,
I 'm reincarnated with moon's whisper in my ear
"Take a deep breath, Replace all sorrows with delight;
Enjoy life with nature, Love all, Let you cheer."

“प्रकाश मंत्र”

- सुनील शर्मा

जीवन तम में प्रकाश मंत्र फूंक गया है कोई।
जाग्रत हो ज्ञान तिमिर में आत्मा है सोई।।

ओढ़ लिए हैं क्यों अकारण
मोह माया के बाह्यावरण
है पिस रही वो कनक भांति
सुप्त व लुप्त हो गई है कांति
न धकेल स्वयं को अग्निकुंड में
जाग्रत हो ...... जाग्रत हो ....

जीवन तम में प्रकाश मंत्र फूंक गया है कोई।
जाग्रत हो ज्ञान तिमिर में आत्मा है सोई।।
आई थी तू विश्व में लेकर नया संदेश

क्यों किया धूमिल स्वयं को देख नया परिवेश
स्वयं न बदल देख कर विश्व की यह धारा
स्वनिर्माण का दृढ़ बल लाएगा परिवर्तन सारा
न धकेल स्वयं को दौर्बल्य में
जाग्रत हो ...... जाग्रत हो ....

जीवन तम में प्रकाश मंत्र फूंक गया है कोई।
जाग्रत हो ज्ञान तिमिर में आत्मा है सोई।।

मंत्र है वशीभूत कर ले मन यह चंचल
ज्ञान मार्ग पर अडिग निर्भीक बढ़े चल
सत्य मार्ग की कठिनाइयों से न डर तू
पाएगी इक दिन अपना लक्ष्य निकट तू
न धकेल स्वयं को अस्मिता में
जाग्रत हो ...... जाग्रत हो ....

जीवन तम में प्रकाश मंत्र फूंक गया है कोई।
जाग्रत हो ज्ञान तिमिर में आत्मा है सोई।।

(पूर्व प्रकाशित Anjali 2014)

वो

- नीलम मलकानिया

यहाँ जापान में कहीं भी चले जाओ लगभग हर एक किलोमीटर पर कोई ना कोई नदी आ ही जाती है। मुझे नदी किनारे टहलना पसंद है ऐसा लगता है कि बहता पानी चुपचाप आपसे कुछ कहना चाहता हो। कई बार मन करता है कि नदी से पूछा जाए कि आज तुमने क्या-क्या देखा? क्या अच्छा लगा? जिस दिन मैं बहती हूँ ख़ुद को नदी मान लेती हूँ और अपने प्रवाह में बहुत कुछ जोड़ने की कोशिश करती हूँ जो आने वाले कुछ समय तक ड्रॉईंगरूम में की गई नई सजावट जैसा मन पर दमकता रहता है और ऊर्जा देता है। नदी से पूछना चाहती हूँ कि क्या बहते-बहते तुम कहीं ठहरना चाहती हो? क्या देखना चाहती हो पल भर रुककर? क्या तुम्हारी सहज प्रवृत्ति से उलट किया गया कोई काम तुम में भी कुछ जोड़ सकता है? बस ऐसे ही कुछ बेतुके से विचारों में खोई घर के पास वाली नदी के किनारे टहल रही थी तभी वो मिली मुझे। वो, एक छोटा सा हल्के पीले रंग का कढ़ाई वाला फ्रॉक पहने और लगभग पाँच इंच की हील वाले मैचिंग सैंडल, बिल्ली के डिज़ाईन वाला पर्स हाथ में झूल रहा था और उसके ख़ूबसूरत चेहरे पर कुछ तैर रहा था। अब नदी लड़की बन गई थी और मेरा ध्यान उस पर चला गया। अब बहते पानी को नहीं बल्कि उसे देख रही थी। वो भी बह रही थी, अपने विचारों में। खोई सी चली जा रही थी। चेहरे पर मेकअप सजाए, बड़ी-बड़ी काली घनी पलकें लगाए और गालों के बाहरी हिस्सों पर लाल ब्लशर लगाए ताकि जब वो हँसे तो उसके चेहरे के दोनों तरफ़ उभरी नन्हीं गुलाबी उठान से वो सुंदर ही नहीं बल्कि तंदुरुस्त भी लगे। जैसे भारत में बड़े बुज़ुर्ग कहते हैं कि बच्चा हँसता है तो शरीर में लगता है। यानी अगर बच्चा ख़ुश है तो तंदुरुस्त भी रहेगा और खाया पिया शरीर में लगता रहेगा। गाल गुलाबी हो जाएँ तो समझो कि शरीर में ख़ून का दौरा अच्छा हो रहा है। ये सोच कर पल भर को मैं मुस्कुरा दी कि ख़ून और सेहत का ये रिश्ता, गुलाबी गाल और देहाती बुज़ुर्गों का ये समीकरण कैसे मेकअप की एक छोटी सी गोल डिबिया और एक ब्रश में समा गया है। हिमोग्लोबिन चाहे जितना भी हो, ब्रश चलाओ और गाल गुलाबी बनाओ। ये सब सोच ही रही थी कि वो मेरे पास से गुज़री और उसी पल मेकअप से बड़ी बनाई गई उसकी आँखों से छलकते आँसू मैंने देख लिए। एक नया देश, अजनबी लोग, आस-पास कोई तीसरा व्यक्ति नहीं और फिर भाषाई बाधा। सहज बुद्धि ने कहा कि मैं बस ख़ामोश रहूँ और उसे ऐसे ही जाने दूँ। फिर अंदर जो एक क़लम रहती है वो सहसा जाग उठी। ... क्या है इन आँसुओं की कहानी ... क्यों रो रही है ये ... ज़ाहिर है कि सब ठीक तो नहीं है .... सहज बुद्धि --- प्यार व्यार और क्या। तोक्यो जैसी अत्याधुनिक जगह में तो ये मामूली बात है। लोग अकेलेपन का शिकार हैं। कोई भी समस्या हो सकती है। क़लम—- फिर भी क्या ये इंसानियत है कि वो लाचार सी, रोती हुई चली जाए और उसे ये भी अहसास ना करवाया जाए कि इस पल ये नदी और मैं उसके आँसुओं से पसीज रहे हैं। बुद्धि--- हो सकता है उसे अच्छा ना लगे। उसकी मर्ज़ी है, जब चाहे रो सकती है। क़लम --- जब चाहे हँस भी तो सकती है। रोने से क्या होगा ? क्या परीकथा हमेशा परी से ही बनती है ? क्या किसी अंजान के चेहरे पर मुस्कुराहट ला देना या उसे ये अहसास करवा देना कि उसका होना भी इस ब्रह्माण्ड में किसी कोने का आरक्षित होना है , परीकथा नहीं है ? ..... कुछ सोच कर उसे आवाज़ लगाई...."सुमिमासेन..."। जापानी में excuse me या sorry को सुमिमासेन कहा जाता है। वो रुकी। पीछे मुड़कर देखा। मैं बिना बोले चेहरे पर हल्की मुस्कान और एक परिचित ऊर्जा लिए उसकी ओर बढ़ी। उसका इस तरह रुक जाना और फिर पीछे देखना। ठीक मेरी आँखों में देखना और अपने आँसू छिपाने की कोई कोशिश ना करना इस बात का संकेत था कि मैं इस शरीर से पहले ही अपने विचारों से उस तक पहुँच गई थी और अब हम अजनबी नहीं रहे थे। "सुमिमासेन... व्हाई आर यू क्राईंग.. व्हाट हैपेन्ड... इफ़ यू फील कम्फर्टेबल , यू कैन शेयर इट विद मी" । ... मैंने धीरे-धीरे अपने शब्दों 94

और इशारों से उसे ये बता दिया कि वो जो कहना चाहती है, कह सकती है क्योंकि कोई है जो इस पल उसे सुनना चाहता है। उसने कुछ पल मुझे देखा फिर कहा ... "सो काइंड ऑफ़ यू, आरीगातो"। ... आरीगातो यानी धन्यवाद। मुझे लगा था कि वो कुछ और बोले बिना बस यही शब्द मेरे हवाले करके चली जाएगी। जापानी समाज में लोग शर्मीले और साथ ही थोड़े औपचारिकता पसंद होते हैं। संकोची स्वभाव भी कई बार आड़े आता है। उसने मुझे चौंकाते हुए पूछा "कैन वी सिट देयर, देयर ऑन द बैंच"?

"ओह यस, कम... वुड यू लाईक टू हैव वॉटर"? मैंने पूछा। ... उसने गर्दन हिला कर मना किया और फिर मुस्कुराने की कोशिश करने लगी। फिर से वही शब्द धीरे से दोहराया , "आरीगातो"। वो हिन्दी नहीं बोल सकती थी और मैं जापानी नहीं जानती थी। तो बची अंग्रेज़ी। उसी भाषा में दुख-दर्द और दिलासे का आदान-प्रदान हुआ। बैंच पर बैठते ही मैंने उसका नाम पूछना चाहा तो उसने फिर से आँसू लुढ़काते हुए नाम बताया ' बैड गर्ल'। फिर एक दो बार यही शब्द दोहराया। मैं समझ गई कि ये उपाधि किसी ख़ास की दी हुई है और संभव है कि जापानी भाषा में वो शब्द कुछ ज़्यादा ही "बैड" रहा हो इसीलिए ये इतनी दुखी हुई। ये मुलाक़ात नाटकीय तो बन ही गई थी तो मैंने भी फिर बिना किसी लाग लपेट के पूछ ही लिया ... "ब्रेकअप"? वो फीकी मुस्कुराहट के साथ बोली.. "नो, पैचअप"। ... पैचअप... यानी कि बिछड़े साथी से फिर से मिलना। तो इसमें रोने की क्या बात?... बिना कुछ पूछे सिर्फ़ उसके बोलने का इंतज़ार करती रही और इस उधेड़बुन में रही कि उससे क्या कितना पूछा जाए ताकि वो असहज महसूस ना करे। ये बिल्कुल अलग अनुभव था और थोड़ा सा अविश्वसनीय भी क्योंकि यहाँ जापान में अक्सर इस तरह किसी का भी बतियाने लगना बहुत अनोखी बात है। पर मेरे साथ भी अनोखा तो घटता ही रहता है तो ये एक कड़ी भी जुड़ गई। उसने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ से हूँ और फिर ख़ुद ही कहा, इंडिया ? फिर थोड़ी सी औपचारिकता के बाद नमस्ते और सारी (साड़ी) शब्द से अपना परिचय बताने के बाद जो कहानी सुनाई वो कुछ इस तरह थी। ..वो तोरेयामा या तारायामा जगह से थी शायद और यहाँ तोक्यो में किसी कंपनी में काम करती है। इलैक्ट्रोनिक्स की कंपनी है इसलिए उसने अंग्रेज़ी सीखी ताकी बाहरी लोगों से बातचीत की जा सके। उसका दो साल पहले ब्रेकअप हुआ था क्योंकि जितना समय वो दोनों एक साथ बिताना चाहते थे उतना समय उनके पास था ही नहीं और फिर इसी के साथ कुछ और बातों पर भी मनमुटाव शुरु हुआ। एक दिन लड़की को अहसास हुआ कि इस तरह हर समय नाराज़ रहना और एक दूसरे को सिर्फ़ ढोते रहने से अच्छा है कि अलग हो जाएँ। दोनों ने साथ बैठकर ये फ़ैसला किया, फिर वो अलग हो गए और अपने-अपने रास्ते अपना-अपना दिल थामे चल दिए। फ़िल्मी कहानी की तरह फिर एक दूसरे की याद आने लगी। लड़की ने अपने शौक़ से जी बहलाना चाहा और किसी डाँस क्लास में जाना शुरु कर दिया। ख़ुश रहने लगी। कुछ अलग कर रही थी और कंपनी के एक साथी को थोड़ा पसंद भी करने लगी थी। कंपनी के ही काम से अमरीका जाने का सपना भी पालना शुरु कर दिया था और उसके लिए मेहनत भी कर रही थी। यू टर्न लेकर लड़का फिर उसके जीवन में आना चाहता था और परेशान रहते हुए कभी-कभी अपना मानसिक संतुलन खो बैठता था । लड़के के ऑफ़िस मे लोग उससे नाराज़ रहने लगे और उसके काम पर भी असर पड़ने लगा जो कि जापान में एक ख़तरनाक बात है क्योंकि बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ आप अपने काम को चाहे पूरी निष्ठा से करें या मजबूरी में करें, पर आपके काम का स्तर ज़रा ख़राब हुआ कि आपको दूसरा मौक़ा कभी नहीं मिलता। अपने हालात को सुधारने की कोशिश में लड़का फिर से लौट आया उसके जीवन में और वो जो उड़ना चाहती थी, फिर से एक ऐसे रिश्ते में क़ैद हो रही थी जिसका आधार डाँवाडोल था। अब शायद डाँस क्लास और अमरीका कुछ भी नहीं। शायद कुछ समय बाद फिर से वही व्यस्तता और वही मानसिक दबाव। उसने सधे हुए और गरिमामय शब्दों में ये कहानी बताई और जो नहीं बताया वो उसके आँसू बता ही चुके थे। शायद वो मन से इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थी और इसे बस एक दबाव या हालात कहा जाना ही सही था। उसने अपना नाम बताया था और मैंने दो बार दोहराया भी पर अब भूल चुकी हूँ। वो कहाँ से आ रही है, क्या उसी से मिलकर, क्या वो साथ रहते हैं, आगे क्या चाहती है, क्या फिर कोई झगड़ा हुआ था, क्या इस बार कुछ बदला है उन दोनों के बीच, गुड़िया सी लगने वाली लड़की बैड गर्ल क्यों हैं ? ऐसे अनगिनत सवाल मन में पैदा होते रहे और मैं उसे जाते हुए देखती रही। उसे एक अजनबी की ज़रूरत थी शायद उस समय। ऐसा अजनबी जिससे वो बातें कर सकें कुछ देर। जिसके सामने कुछ भी कह सके और ये डर ना हो कि कॉमन फ्रैंड बातों को पंख लगाकर उड़ा देंगे। उसके चले जाने के बाद फिर से बहुत देर तक मैं अपने ही मन में गोते लगाती रही। बिना कोई तथ्यात्मक जानकारी दिए उसका यूँ अपनी बातें कह जाना दिल को छू गया। वो बस बोलना चाहती थी, मेरे बहाने शायद अपने आप से बात कर रही थी। दोहरा रही थी बहुत कुछ। शायद कई बार घुटन के घेरे से निकलने का बस यही सबसे आसान तरीका होता है, अपनी बात बोल देना। फिर चाहे कुछ समाधान निकले आपकी समस्या का या नहीं। वैसे ज़्यादातर तो हम ख़ुद ही सुलझाते हैं अपनी उलझनें, सलाह देने वाले बस कुछ विकल्प हमारी झोली में डाल देते हैं। कौन सी परेशानी जीवन के कितने दिन निगल जाएगी ये भी कुछ हद तक हम ही तय करते हैं। इसीलिए शायद वो समाधान तो ख़ुद तलाशना चाहती थी लेकिन उस विशेष पल की ज़रूरत बस बात करना थी , तो उसने एक अजनबी से बात कर ली। यहाँ कुछ दोस्त ऐसे ही मिले हैं मुझे, अचानक। अब उनका फोन नंबर है मेरे पास और जब तब बातें भी होती रहती हैं। पर उनके बारे में कुछ लिखा नहीं। ये लड़की इतनी जल्दी काग़ज़ पर उतर जाएगी पता नहीं था। अगर फोन नंबर्स या नेम कार्ड की अदला-बदली हुई होती तो शायद एक प्रक्रिया शुरु हो जाती और इसके बारे में भी कुछ ना लिख पाती। पर इससे तो दोबारा मिलने की कोई उम्मीद नहीं, कोई अता-पता नहीं। वो चुपचाप चली जा रही थी, फिर से अपना झूलता पर्स संभाले और ख़ुद को समेटते हुए। वो थोड़ी सी मुझ में बच गई थी और थोड़ी सी उस नदी में। नदी और मैं दोनों ठहर गए थे और बस बहे जा रही थी 'वो'। चाहती हूँ कि वो ख़ुश रहे, क्या पता कल फिर से हम कहीं ऐसे ही अचानक मिल जाएँ। तब तक बस मैं उसे ऐसे ही याद रखना चाहती हूँ, इसी शब्द से `वो'। ■

(पूर्व प्रकाशित Anjali 2014)

कुछ कहना चाहता है मन...

- सारिका अग्रवाल

ख्वाब

वो कदम बढ़ते रहे उन
ऊँची ऊँची दिवारों की तरफ,
कहीं खिड़की से एक रोशनी की
किरण पर हम बढ़ चले....
विशालकाय उस कक्ष को
देखकर कुछ सिमटे,
फिर नज़र पड़ी उन नौजवानों पर,
हुए तल्लीन थे जो खेल में
बढ़ी लगन से....
नतमस्तक हो गया सर
उनका यह परिश्रम देखकर,
क्यों ना हो इस देश का गौरव
यह बच्चे...
फिर उठे कदम और बढ़ने लगे
अपने ही ख्यालों में....
छोड़ आये थे अपना देश पीछे,
पर आज भी थिड़कती हैं यादें,
एक नया ख्वाब सजा लिया उन
कुछ पलों में....
मात्रभूमी के उन नौजवानों के लिये,
जो हमारे देश को भी
गौरवानवित करेंगे कभी...
कुछ ऐसे ही खेल परिक्षण मैदान होंगे,
हर खेल की शिक्षा जहाँ सम्भव होगी,
मेहनत की हर दिल को तमन्ना होगी,
क्यों ना होगा मेरा देश भी उस शिखर पर....
जहाँ नतमस्तक हर देश होगा!!

बढ़ते रहो

कुछ खराब लम्हों को अपने
दिल से लगा कर क्या करोगे.....
जो कुछ अच्छा हुआ उसे क्या
भूल जाओगे....
ज़िंदगी में बढ़ते रहोगे तो
मंज़िल पा जाओगे....
रुक गया कदम अगर तो
बहुत पीछे रह जाओगे।

आँसू

तुमसे क्या बोलूँ सखी....
और तुम्हें क्या समझाऊँ
बस कुछ आँसू पलकों पर ले आऊँ....
यह आप बीती गहरी इतनी....
कुछ क्षण मौन हो जाऊँ....
यह सोचूँ इन बेबस टपकते
हुए आँसुओं को कैसे रोकूँ...
तुम्हें पूछूँ या खुद को पूछूँ....

रिश्ते

वो टूटते, वो सड़ते, वो रोंदे हुए रिश्ते,
वो घिसटते हुए ज़मीन पर
लहूलुहान हुए रिश्ते
वो दिलों को चीरते,
वो बिलखते, वो सिसकते
वो हैवान से यह रिश्ते
वो समाज की बंदिशों में घिरे हुए
वो डरते, सिमटते वो हारे हुए से रिश्ते,
फिर भी रिश्ते कैसे
कैसे हैं यह रिश्ते।

वो यादें

बहुत कुछ लिखना चाहता था मन
उन कोरे कागज़ों पर,
पर समझ नहीं आया अपने
जज़बातों को कैसे शब्द दें....
बहुत सिमटे थे उन यादों में,
पर समझ नहीं आया उन्हें
कैसे वर्तमान दें....
दिल बहुत उदास था,
कि अपनी आवाज़ को पहचान
पाना भी मुश्किल था....
एक आवरन इतना गहरा था जीवन पर,
कि अपना जीवन भी बोझ था ज़िंदगी पर।

(पूर्व प्रकाशित Anjali 2014)

リシケシ滞在記---スワミ・チダーナンダ

生誕100周年に寄せて

－新田　裕子

「思いが形になる」

新田ゆう子

『大きな行為ができないのであれば、せめて1ルピーを乞うて素焼きの水差しを買い、道端に座って喉の渇いた通行人に飲み水を差し上げなさい。喉の渇いた人に飲み水を差し出すことも偉大な行為だよ』

スワミ・ヴィヴェーカーナンダは、弟子のニスチャヤーナンダに、施しだけを受け続けることは、サードゥの堕落につながると、こう言ったのです。このようにして始まる、スワミ・ニスチャヤーナンダの生涯の話を、昨年の夏、日本ヴェーダーンタ協会発行の雑誌「不滅の言葉・特別号」で読みました。ニスチャヤーナンダが、師のこの言葉を受け、兄弟弟子のスワミ・カリヤーナーナンダと共に活動をし、発展していったというハリドワール　カンカルにあるラーマクリシュナミッション・セバアシュラムを訪れてみたい、と思うようになりました。その願いは案外早く、4か月後には実現したのです。

最初、『ラーマクリシュナ奉仕の家』としてスタートした時は、3つの小屋だったというこのアシュラマは、スワミ・ヴィヴェーカーナンダの「リシケシやハリドワールで修行す僧たちが病気になった時に何かしたい」という願いを、弟子のカリヤーナーナンダに託し開設されたのだということです。

わたしがそこを訪れたのは、インドで一番気候のいいとされる11月中旬の朝。一刻も時間を無駄にしたくなかったので、早朝ではなかったけれど、朝食もそこそこにリシケシを発ったのです。車がアシュラムのゲートを入って、びっくりしたのは、張り巡らされた塀の外側からは想像もつかないほど広大な敷地が広がっていたからです。早かったため、宿泊手続きを取るためのオフィスには、担当のスワミジはまだ出てきていませんでした。外のベンチで待つこと数分。ほどなくスワミジが現れ、アシュラムで働くヒンディー語しか話せない女性が、部屋に案内してくれました。宿泊手続きもない、あまりにあっさりした応対に、ちょっと拍子抜け。自分の部屋となった室内も広かったのですが、敷地内が広くて、その建物まで道に迷わないように目印を見つけておく必要がありました。

「まずホットシャワーを浴びてゆっくりしなさい」と言われ、また、朝食を食べていないわたしのために、部屋にはチャイの入ったポットと、ケーキやチョコレートを載せたお皿が運ばれてきました。シャワーはすぐお湯が出るように、電熱スイッチが入っていました。なんだか至れり尽くせりで、あっさりした応対とは反対の温かい心遣いに、ラーマクリシュナの家に来た、という実感が湧きました。

ほどなく、ここのアシュラムの長のお坊様にご挨拶に行きました。まるで子供のような眼を持っていらしゃるのに、周囲を圧倒してしまうような存在感に、一歩後ろに引いてしまったほどです。

「何か聞きたいことはありますか？」と言われ、「今は特にありません」としか返す言葉が出ませんでした。その後、この方と会話をする機会はなかったのですが、敷地内でお姿を見かけるたびに、遠くからでも自然に合掌をしていました。

それから、昼食までの時間、ここで仕事をしている若い男性に、アシュラム内を案内してもらいました。ラーマクリシュナ、スワミ・ヴィヴェーカーナンダ、カリヤーナーナンダとニスチャヤーナンダの名を冠したプレートを掲げた、6階建ての大病院。救急センターに薬局、売店。病院の医師や看護婦、職員が住まう何棟ものアパートメント。食堂とキッチン。すべて自給なのか、野菜畑と牛を飼う牧場。そして、沢山の花を植えた花畑と芝生。僧侶の住まう建物。車寄せの前には、ヴィヴェーカーナンダの胸像が花に囲まれて建っています。勿論、敷地の中央には、シュリー・ラーマクリシュナをお祀りする寺院が建っていて、朝晩にはアラティが行われています。牧場を抜けてさらに行くと、スワミジー(ヴィヴェーカーナンダのこと)が沐浴し瞑想したという、ガンガーのガートに行き当たります。その水のきれいなこと！！コルカタの方では澱んでいる河の水が、太陽の光を反射して輝いているほど、透明なのです。病院内もすべて案内してもらうと、もう昼食の時間でした。流石に疲れた･･･。

院内には、サドゥが入院する部屋もありましたし、ミッションのお坊様の医師も何人かいて、普通の病院とはそこが違うところでしょうか。

昼食には、牧場の牛から採れたミルクで作ったと思われるヨーグルトが出ました。今まで行った、ミッションの食堂と違って、アシュラムや病院で働く人と一緒の食事です。お坊様たちは壁を隔てた隣の部屋で摂っておられました。

午後、寺院と病院が昼休みになって、わたしも部屋で休みましたが、雑誌で読んだ『奉仕の家』から、この巨大なアシュラムにどうやって発展していったのか･･･。考えるものの、想像もつきません。ラーマクリシュナの力が背後に働いていなければ、到底あり得ないのではないだろうか･･･。

多くの人々を動かし働かせる、神の力。

また、自分は一体、雑誌のあの話のどこに惹かれたのか？ここに来るまで、何度も読み返し、読むたびに感動して涙が溢れてしまうのでした。

西洋でのヴェーダーンタの講演から帰国したスワミジーに一目会いたいがため、南インドの村からマドラス(チェンナイ)まで、何日も歩いて行った(汽車賃がないために)というニスチャヤーナンダ。(当時はまだ出家していなかった)初めて会ったスワミジーの弟子になりたいと願い、叶ってからは、スワミジーの肉体がこの世を去るまで、そばでお仕えした。その後、ベルルマトを離れ、遊行の途中に『奉仕の家』とスワミ・カリヤーナーナンダに遭遇し、そこで生涯を終えるまで、『人間の中に神を見て、その神に奉仕をする』という、スワミジーの教えを実践することになったのです。この一途な思いを持続できる純粋さは、スワミジーの力なのか、ニスチャヤーナンダの並外れた霊性の力なのか。或いはその両方なのかもしれません。『奉仕の家』で働く間、リシケシまで、街道の僧たちのために物資や薬を運び、治療を施し、28Kmの道を毎日往復したというニスチャヤーナンダ。その、強靭な愛と信仰心は肉体を忘れさせてしまうのだろうかと、感嘆するばかりです。

翌日も、その翌日も、この大病院には、やって来る患者さんが後を絶ちませんでした。コーヒーやチャイを飲みに行っていた入り口にある小さな売店のおじさんは、いつもニコニコして親切でした。

帰る朝、ご挨拶に行くと、オフィスのスワミジは「またおいで！」と、笑って一言。来た時と同じ、やっぱりあっさりとした応対でしたが、思わず「はい、また来ます！」と応えるほど、優しい笑顔でした。

リシケシまで行く車の中で、「自分は到底、この道を歩いてリシケシまで行けない」と、またすぐ、ニスチャヤーナンダのことを思い返していました。■

コルカタの街中に建つ、スワミ・ヴィヴェーカーナンダの像